জাতীয় জীবনচরিতমালা

শ্রীমা

শ্রীমা

প্রেমা নন্দকুমার

অনুবাদ

ডঃ সজল বসু

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

ভূমিকা

পশ্চিম থেকে বহু প্রসিদ্ধ মহিলা ভারতকে বেছে নেন তাঁদের সাধনাকেন্দ্র, কর্মক্ষেত্র ও সাধনভূমি হিসাবে। ভগিনী নিবেদিতা, এ্যানি বেসান্ত, ইভা স্কুডার, মীরা বেন, মাদার টেরেসা...তালিকা বেড়েই চলেছে। এইসব ব্যক্তিত্ব স্বকীয় জীবনের বিলাস-বাহুল্য ছেড়ে তাঁদের মনোনীত ভূমি ভারতবর্ষের মানুষের জন্য নবজীবন সৃষ্টির প্রেরণায় দুঃখকষ্ট বরণ ও আত্মত্যাগ করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের, পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীমা মীরার সেবাকার্যেও একই অনুপ্রেরণা ছিল এবং অত্যাশ্চর্য ফল পেয়েছিলেন তিনি। 1878 সালের 21 ফেব্রুয়ারী প্যারিসে তাঁর জন্ম। তিনি প্রথম পণ্ডিচেরী আসেন 1914 সালে এবং শ্রীঅরবিন্দের সাথে তাঁর স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলায় সহযোগিনী হন। 1950 সালে তাঁর মৃত্যুর পর মা কাজ চালিয়ে যান। শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন ছিল মানবচেতনার রূপান্তর এবং পৃথিবীতে ঐশ্বরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। 1973 সালের 17 নভেম্বর 95 বছর বয়সে মা তাঁর দেহ ছেড়ে চলে যান। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম-এর স্থপয়িত্রী এবং প্রভাতনগরী অরোভিল-এর মূল প্রেরণাদাত্রী রূপে শ্রীমা চিরদিন এক জীবন্ত শক্তির প্রতীক হিসাবে বিরাজ করবেন।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট যখন আমায় মা'র একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে বলেন, আমি বিস্ময়াভিভূত হই ; কেননা আমি জানতাম একাজ করা অত্যন্ত দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ। তবু আমার বাবা কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের প্রেরণা পেয়ে আমি এ কাজের দায়িত্ব নিই, তবে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না এমন নয়।

ত্রিশ বছর আগে ছেলে-বয়স থেকেই আমি এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠি যেখানে শ্রীঅরবিন্দ ও মা দুজনেই ছিলেন উপস্থিত। আমার গ্রন্থ *A Study of Savitri* সম্পূর্ণ করার পর মা'র দর্শন-এর জন্য অনুমতি পাই এবং বাবার সাথে যতক্ষণ মার কাছে ছিলাম (এটা ছিল 1961 সাল), আমার মনে হয় তিনি যেন করুণার মূর্ত প্রতীক। সেই শক্তিসম্পন্না ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা করা যায় কীভাবে ?

গত বছর বাবা তাঁর আগের বই *On the Mother* (1952)-এর পাণ্ডুলিপি

সংশোধন ও পরিমার্জন করছিলেন। তিনি মার সম্বন্ধে তাঁর সমগ্র গবেষণার পাণ্ডুলিপি আমায় দিলেন। আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল। কারণ আমার কাজে কোথা থেকে কতটুকু নেব এবং তা কীভাবে প্রকাশ করব, এটাই ছিল মূল ব্যাপার। আমার বাবা এই পাণ্ডুলিপির কপি দেখেন এবং এর পরিমার্জনায় পরামর্শাদি দেন ; তাঁর সেইসব পরামর্শ আমি নিয়েছি।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কপিরাইট বিভাগের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃতি তুলতে তাঁরা অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

বিশখাপত্তনম

প্রেমা নন্দকুমার

প্রথম অধ্যায়

অন্বেষণ

দিব্য যাত্রা সুরু হয়েছে
সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী উষা
সত্যের মতোই যিনি মহীয়সী
তাঁর কোমল তনু থেকে
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে আলো।
ঐশী উষা
যিনি সাথে নিয়ে এসেছেন স্বর্গীয় প্রভা
তাঁকে দেবতারা বন্দনা করছেন
হৃদয়ের স্বতোৎসারিত অর্ঘ্য দিয়ে।

ঋগ্বেদ
(শ্রীঅরবিন্দ কৃত ইংরাজী থেকে অনূদিত)

সূচীপত্র

ছেলেবেলা ও কৈশোর

মীরা আলফাসার জন্ম প্যারিসে, 1878 সালের 21 ফেব্রুয়ারী। তাঁর বাবা ছিলেন ধনী লোক, কাজেই মীরার জীবন ছিল স্বচ্ছল। শিশু মীরার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব ব্যবস্থাই ছিল। পরিবারের সবাই, বিশেষ করে তাঁর বাবা-মা ও বড় ভাই শিশু মীরার মনজয়করা স্বভাবে অনাবিল আনন্দ পেতেন।

মীরার ছেলেবেলা সম্বন্ধে খুব কম কথাই শোনা যায়। তবে কিছু কিছু ঘটনার থেকে বোঝা যায় কীভাবে ছোট বয়সেই তাঁর মধ্যে চিরস্মরণীয় গুণাবলীর লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। শৈশব থেকেই তিনি অন্তর্মুখী স্বভাবসম্পন্না ছিলেন। বয়স যখন চার, তখন তাঁর জন্য তৈরি করা একটি ছোট্ট চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকতেন এবং সমগ্র সত্তায় এক মহান আলোকরশ্মির অবরোহণ অনুভব করতেন। তাঁর যুক্তিবাদিনী মায়ের কাছে এ ধরণের আত্মমগ্নতা খুবই চিন্তার বিষয় ছিল এবং একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐভাবে মুখ করে তুমি বসে থাক কেন, মনে হয় যেন সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার ওপর ভর করেছে?' মীরার উত্তরও বেশ মনে রাখার মতো: 'হ্যাঁ ঠিকই, সারা পৃথিবীর দুঃখযন্ত্রণার ব্যথা আমি অনুভব করি।'

এই অবরোহণকারী আলোকরশ্মি ক্রমে তাঁর মাথার চারদিকে জ্যোতির আকারে চিরস্থায়ীভাবে দেখা যেতে থাকল। এ বিষয়ে সারা জীবনই তিনি সচেতন ছিলেন:

> পাঁচ বছর বয়সের পর থেকেই—গত 86 বছরের জীবনে—আমি সব সময়েই এটা দেখেছি, এর সূত্র ধরেই জীবনকে এক নির্দিষ্ট রূপ দিতে চেয়েছি: এটা আমার জীবনের দিশারী আলোকবর্তিকার মতো।[1]

যাই হোক, এর অর্থ এই নয় যে, বিশেষ কোনো দুঃখবোধে তাঁর ইহজীবন তমসাচ্ছন্ন ছিল। এই পৃথিবী ও মানুষের জন্য আরো উজ্জ্বল ও গৌরবময় ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্নেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ীই তিনি বন্ধুবান্ধবদের সাথে খেলাধূলা বা সার্কাস দেখতে না গিয়ে এক অন্তর্মুখীন জীবনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে মীরার বাবা-মা তাঁর

---

1. এম. পি. পণ্ডিতের *Service Letter*, নং 16, পৃ: 4

পড়াশোনার ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে মেয়েকে নিজের পথে চলতে দিয়েছেন। সেজন্য সাত বছর বয়স পর্যন্ত মীরার অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না। একদিন মীরা দাদার সাথে রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন, দাদা সাইনবোর্ডের লেখাগুলি পড়তে পারছিলেন. কিন্তু মীরা পারছিলেন না। তাঁর দাদা বোনের অজ্ঞতায় বিস্ময়বোধ করলেন। সেদিন থেকেই মীরা লেখাপড়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই লিখতে পড়তে শিখে গেলেন, নিয়মিত স্কুলে যেতে থাকলেন এবং শীঘ্রই ক্লাসের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হলেন। লেখাপড়ার সাথে সাথেই এক স্টুডিওতে ছবি আঁকা শিখতে লাগলেন, এবং সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করে তাতে পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। খেলাধুলায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন; আট বছর বয়সে টেনিস খেলতে শিখলেন। উৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকায় তিনি সর্বদা প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের সাথে অনুশীলন করতে যেতেন :

> সব সময়েই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের কাছে যেতাম ; কোনো কোনো সময়ে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে যেতেন বটে, কিন্তু শেষে আমার সঙ্গে খেলতেন—কোনো সময়েই আমি জিততে পারিনি, কিন্তু অনেক কিছু শিখেছি।[1]

ছাত্রী-হিসাবে গম্ভীর প্রকৃতির, ভাবপ্রবণ অথচ দৃঢ়চেতা এই ব্যক্তিত্বে প্রকৃত নেত্রী ও বিচারকের গুণাবলী ছিল। এবং তাঁর পক্ষপাতহীন, পরিণত বিচারবুদ্ধির প্রতি বন্ধুদের প্রগাঢ় আস্থা ছিল। নিজেদের সমস্যা নিয়ে তাঁরা তাঁর কাছে আসতেন, বিশেষ করে প্যারিসের যে-স্টুডিওতে তিনি ছবি আঁকা শিখছিলেন সেখানকার সহপাঠীরা :

> শান্তভাবে তিনি স্বকীয় কর্তৃত্ব এমন সুন্দরভাবে কার্যকর করতেন যে তাঁর বোঝাবার ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির গুণেই স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরখাস্ত এক মনিটর স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[2]

---

1. *Mother India*, জুন 1975, পৃঃ 457
2. কে. ডি. শেঠনা, *Mother India*, ফেব্রুয়ারী 1958

সেবার আদর্শ

বারো বছর বয়স নাগাদ তিনি মানবজাতির নেত্রী হিসাবে ও পৃথিবীতে নবযুগ প্রবর্তনকারিণী অগ্রদূতী হিসাবে স্বকীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হন। প্যারিস সংলগ্ন ফনটেনব্লু বনভূমিতে তিনি প্রায়ই নিঃসঙ্গ বিচরণ করতেন। সেখানে প্রায়ই গভীর আত্মনিমগ্ন হয়ে তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়তেন, কোন কোন সময়ে প্রকৃতির সাথে একাত্মবোধের অভিজ্ঞতা এবং চারদিকের বৃক্ষ লতা পাতা পশুপক্ষীর সাথে আত্মীয়তাবোধে সম্পৃক্ত হয়ে শিহরিত হয়ে উঠতেন। সচেতন অবস্থার এইসব অভিজ্ঞতা তাঁর স্বপ্নেও প্রতিফলিত হোত :

> এগারো হতে তেরো, এই বয়সের মধ্যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করি এবং সর্বময় ঈশ্বরের সাথে মানুষের একাত্ম হওয়ার সম্ভাবনা অথবা চেতনা ও কর্মে তাঁর ম হিমা প্রকাশ, ইহজগতে ঐশ্বরিক জীবনে তাঁর সত্তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতে পারে বলে বুঝতে পারি। এই লক্ষ্যসাধনে আমার কয়েকজন শিক্ষক নিদ্রামগ্ন অবস্থায় এর অনুশীলন করতে শিখিয়েছিলেন, এঁদের কারো কারো সাথে পরে আমি সাক্ষাৎ করেছি। পরবর্তীকালে, অন্তরে ও বাহিরে এই ক্রমবিকাশ চলতে থাকলে তাঁদের সাথে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি আমার কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে।[1]

স্বপ্নে যেসব মুখ দেখতেন, পরে বাস্তব জীবনে কারো সাথে তার মিল খুঁজে পেতেন না। যদিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না, এই স্বপ্নে-দেখা মুখ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বলে নিজে বলতেন এবং স্মৃতি মন্থন করে তাঁর মুখের ছবিও এঁকে দিতেন।

যখন বয়স তেরো, দিনের পর দিন মীরা স্পষ্ট এই মুখ স্বপ্নে দেখতেন। একবছর ধরে এরকম চলল এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব নতুন রূপ পেল, ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ মানবজাতির পরিত্রাণকর্ত্রী হিসাবে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর মধ্যে মূর্ত হোল :

> ...প্রতিদিন রাতে শোওয়ার পরই মনে হোত আমি যেন দেহ থেকে বেরিয়ে বাড়ীর ওপর দিয়ে সোজা উঠে যাচ্ছি, তারপর শহর ছেড়ে অনেক উঁচুতে চলে

---

1. এ. বি. পুরানী, *Life of Sri Aurobindo* (প্রথম সংস্করণ, 1958) পৃঃ 70

> যাচ্ছি। তারপর দেখতাম, আমার চেয়ে বড় একটা সোনার পোষাক পরে আছি, আমি উঠলেই পোষাকটা বড় হয়ে আমার চারদিকে বৃত্তাকার মতো হয়ে সারা শহরের ওপর যেন বিরাট এক ছাদের আকার নিত। তারপর দেখতাম, চারদিক থেকে নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, অসুখী লোক বেরিয়ে আসছেন ; তাঁরা সেই প্রসারিত পোষাকের নীচে সমবেত হয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, যন্ত্রণার কথা বলে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন করছেন। প্রত্যুত্তরে জীবন্ত ও কোমল আচ্ছাদন তাঁদের প্রত্যেকের দিকে প্রসারিত হোত, তাঁরা সেটা স্পর্শ করলেই নিরাময় হয়ে শান্ত হতেন এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি সুখী ও সুস্থ হয়ে নিজ নিজ দেহ ধারণ করতেন। এর চেয়ে সুন্দর কিছু ছিল না আমার কাছে, কোন কিছুই এত বেশি সুখী করত না আমায়। রাতের এই ক্রিয়াকলাপই ছিল আমার প্রকৃত জীবন, তুলনায় সবকিছুই—দৈনন্দিন কাজকর্ম আমার কাছে মনে হত বর্ণহীন, নিষ্প্রাণ।

মীরার বাল্যজীবন ও এই স্বপ্ন স্মরণ করিয়ে দেয় আর এক মহীয়সী তামিল নায়িকার কথা। নাম তাঁর মনিমেখলাই। তিনিও অল্পবয়সে আধ্যাত্মিক জীবনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মানুষের দুঃখকষ্টে কাতর ছিলেন। তাঁর ধারে-কাছের লোকেরা মনে করতেন, তিনি মানবজাতিকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যই জন্মেছেন। স্বকীয় জীবনাদর্শসাধনে তাঁকে মনুষ্যসৃষ্ট ও ভাগ্যনির্ধারিত বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। মীরার প্রথম জীবন ও পরবর্তী আধ্যাত্মিক জীবন ও সেবাবৃত্তির সাথে মনিমেখলাইয়ের ভাবমূর্তির তুলনা করা হয় : উদ্যানস্থিত 'পদপঙ্কজগীতিকা'র সম্মুখে দণ্ডায়মানা মনিমেখলাই ঐশ্বরিক পাত্র 'আমুধসুরভি' থেকে মানুষের ক্ষুধা মোচন করছেন। সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে এসে করুণা লাভ করেছিল এবং সব বিপদমুক্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল। মনিমেখলাইয়ের মা-ও বুঝেছিলেন যে তাঁর মেয়ে ভবিষ্যতে যোগিনী ও মুক্তিদাত্রীর ভূমিকা নেবেন। মীরার বাল্যজীবনের স্বপ্নও এই সুরেই বিধৃত :

> শিশুটি প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎদ্রষ্ট্রী হিসাবে ধন্য, মহান পরিত্রাতৃ। হিমালয়সম বেদনার পাহাড়ও তাঁকে বিধ্বস্ত করতে পারবে না ; তাঁর পবিত্র প্রসারিত ঐশ্বরিক পোষাক ভেতর দিকে চলার সাথে সাথে নিরাময়-ক্রিয়া শুরু হয়, এবং সব যন্ত্রণার উপশম হয়।[1]

---

1. কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, *On the Mother* (1952) পৃ: 8–9

মীরার বয়স যখন সবেমাত্র পনের, তখন স্কুলে লেখা তাঁর একটি রচনা পাওয়া যায়। পরের দিনের জন্য কাজ তুলে রাখতে অভ্যস্ত এক ছাত্রের দুঃস্বপ্নের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে লেখাটিতে। শেষে তিনি ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নে দেখা পথ, রাজপথ ও দুর্গের প্রতীক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন :

> এসবেরই সোজা ব্যাখ্যা হচ্ছে : পথ পরবর্তীকালের প্রতীকবাহী, রাজপথ আগামীদিনের এবং বিশাল অট্টালিকা বা দুর্গের অর্থ 'কিছুই নয়'-এর সমার্থক। নিজের চতুরতায় উৎফুল্ল হয়ে সে কাজে হাত দিল এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল, আজ যা করা যায়, কালকের জন্য কোনো সময়েই ফেলে রাখবে না।[1]

অভিজাত সমাজের বালিকার কাছে এ ধরণের একাগ্রতা অস্বাভাবিক ছিল। তার পর থেকেই তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত বইপত্র পড়তে শুরু করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্ঞানযোগ' পড়ে এক শিহরণময় জ্ঞানপ্রভায় তাঁর আত্মা সমৃদ্ধ হল। গীতায় 'স্বকীয় সত্তায় স্থিত ঈশ্বর তথা স্বতঃপ্রসূত ভগবদ্‌সত্তার প্রতীক' সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান পেলেন, এবং যদিও প্রচলিত ধ্যানধারণা ও ব্যাখ্যার সাথে তিনি একমত ছিলেন না, তবু গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে সহজাতভাবে এক ধারণা পেয়ে গেলেন।

দুজ্ঞেয়বাদের পটভূমি

আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঔৎসুক্য থেকেই মীরা দুজ্ঞেয়বাদ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী হন। অবশ্য মানবজীবন ও ঘটনাবলীর ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্যই তিনি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এমন নয়। গূঢ় তত্ত্ব বা দুজ্ঞেয়বাদ তাঁর কাছে এক 'গতিময় আধ্যাত্মিকতা' স্বরূপ ছিল। এর ঐহিক ভিত্তিকে সবল করার জন্য তিনি একে আধ্যাত্মিক আলোয় সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বরের করুণায় দুজ্ঞেয় অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করা যায়, অন্তর্জগতের দীর্ঘ সংযমে এর অর্জন সম্ভব।

---

1. *Words of Long Ago* (1952) পৃঃ 5–6

সত্যের প্রতি তন্নিষ্ঠ থাকলে এবং ক্ষণস্থায়ী প্রসাদ পেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলেই এর উপযোগিতা পাওয়া সম্ভব :

> সত্যের দ্বারে উপনীত হলেই সব মিথ্যাচার, কৃত্রিমভাব ও বাহ্যাড়ম্বর থেকে মুক্ত হওয়া যায়...যারই দুজ্ঞের্য় ক্ষমতা আছে, স্বকীয় সত্তায় নিহিত সত্যের কিঞ্চিৎ প্রয়োগে সে সব ধরণের—সাদা কালো বা যে কোনো রঙের—জাদুজালের মোকাবিলা করতে পারে।[1]

1902 সালে বয়স যখন 24, তখন মীরা আলজিরিয়া যান প্রখ্যাত মঁসিয়ে থিয়ঁর কাছে পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য। যদিও তিনি বহু বিষয়েই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন (যেমন দেহ থেকে বেরিয়ে উচ্চমার্গে বিচরণ বা বহু দূর থেকে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ), কিন্তু তিনি এসবের ওপর গুরুত্ব দেন নি। দুজ্ঞের্য় বিষয় অনুশীলনের ফলে ঐহিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে এক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন, তাই সাপের মতো ভয়াবহ জীবের উপস্থিতিতেও নিস্পৃহ থাকতেন।

মঁসিয়ে থিয়ঁর সাথে ইউরোপ ভ্রমণের পরই মীরা তাঁর ছাত্রীজীবনে ইতি টানেন। সমুদ্রযাত্রাকালে থিয়ঁর নির্দেশক্রমেই একদিন তিনি জাহাজটিকে বিপদসঙ্কুল ঝড় থেকে উদ্ধার করেন।

কিন্তু মীরা কোনোদিনই লোকদেখানোর জন্য এইসব অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নি। কারণ তিনি জানতেন, দুজ্ঞের্য়বাদের মতো বিজ্ঞানের অপব্যবহারও সহজ। তাঁর কাছে এই ক্ষমতাও ঈশ্বরের সেবায় কাজে লাগাবার মাধ্যম-স্বরূপ ছিল। এর দ্বারা তিনি কিছু অন্তর্দৃষ্টি ও কার্যকরী ক্ষমতার অধিকারিণী হন, কিন্তু তিনি জানতেন যে এই অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের চেয়ে আরো মহান লক্ষ্য রয়েছে। 1906 সালেই তিনি বুঝেছিলেন, 'আরো মহত্তর জীবনের দিশা দেওয়ার জন্যই মর্ত্যধামে তাঁর দেহধারণ'[2] এবং এই লক্ষ্যসাধনে সবসময়েই তিনি দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা সর্বগুণান্বিত করে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন। আলস্য, সিদ্ধান্তহীনতা, মূর্খতা, বাহ্যাড়ম্বর ও তামসযুক্ত সব ত্রুটি থেকেই মীরা মুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে একথা মনে করে বলছেন :

---

1. *Questions and Answers* (1957–58) পৃ: 340–41
2. *Breath of Grace*, সম্পা. এম. পি. পণ্ডিত (1973) পৃ: 366

> যখন ঠিক করতাম উঠব, তখনই লাফিয়ে উঠে পড়তাম। কোন অসুবিধা হ'ত না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করতেন, 'কীভাবে এটা কর? আমরা যখন উঠব ভাবি, তার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হয়।' তাঁরা আশ্চর্য হয়ে যেতেন। আর আমি আশ্চর্য হতাম এর বিপরীত অবস্থা দেখে! নিজের মনেই ভাবতাম, 'এটা কীভাবে হয়?' যখন কেউ উঠবে ঠিক করে তখন সে উঠেই পড়ে।[1]

প্যারিস গোষ্ঠী

আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণে প্রত্যাশী এই অভিজাত তরুণী প্যারিসের সমাজে তারকা হিসাবে গণ্য ছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে মীরা দক্ষ শিল্পী এম. মরিসেটকে বিবাহ করেন। তাঁদের আঁদ্রে নামে এক পুত্রসন্তানও ছিল। মা হিসাবেও মীরা আদর্শ ছিলেন। আঁদ্রের শৈশব ছিল আনন্দময়। কিন্তু বিবাহজীবন ও মাতৃত্ব আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। যেমন মীরার Rue de Val-de-grace-এর বাড়ীতে বহু দর্শনাকাঙ্ক্ষী আসতেন। দার্শনিক চিন্তা ও অর্থবহ জীবন সম্পর্কে আলোচনা চলত। এই গোষ্ঠীর জনৈকা আলেকজান্দ্রা ডেভিড-নীল এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মীরার প্রতিভা সম্বন্ধে বলেছেন :

> বন্ধুবান্ধবদের সাথে মনোরম সন্ধ্যা উপভোগ করতাম। ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনায় আমাদের বিশ্বাস ছিল। মাঝে মাঝে Bois de Boulogne বাগানে যেতাম, সেখানে বিমান ওঠার ভঙ্গিতে ফড়িং-এর ওড়া দেখতাম।
>
> তাঁর মহত্ত্ব, পারদর্শিতা ও মেধার কথা মনে পড়ে।
>
> তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার ও মহান প্রেম, কোনো বড় কাজ করার পরও তিনি সহজাতভাবে এমন ভাব করতেন যেন কিছুই হয়নি। তবু কিন্তু তাঁর মধ্যেকার বিরাট ক্ষমতা চাপা থাকত না।[2]

এটা এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিল, তবে স্বকীয় লক্ষ্যে সন্নিষ্ঠ। 1912 সালে এর সদস্য-

---

1. *Questions and Answers* (1950–51) পৃ: 323–24
2. Interview with Prithwindra Mukherjee, *The Sunday Standard*, জুন 15, 1969

সংখ্যা দাঁড়ায় বারো এবং নাম হয় 'Cosmique'; প্রতি বুধবার সবাই মিলিত হতেন। এসব সভার বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায় মীরার *Words of Long Ago* গ্রন্থে। ধর্মীয় গ্রন্থাবলী, গীতা, উপনিষদ, ধম্মপদ, পাতঞ্জলীর যোগসূত্র, নারদের ভক্তিসূত্রের অনুবাদ করে মীরা তাঁর ইউরোপীয় সাথীদের মধ্যে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আগ্রহ গড়ে তোলেন। গোষ্ঠীর বাইরের লোকও সভায় আলোচনা ও পরামর্শের জন্য আসতেন। 1907 সালে রাশিয়ার গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের জনৈক কর্মীও আসেন :

> কিয়েভে একদল ছাত্র আছে, তারা মহান দার্শনিক আদর্শ সম্বন্ধে উৎসাহী। আমরা আপনার বই পেয়েছি এবং দেখে খুশী যে এতদিনে এমন এক সামগ্রিক শিক্ষা পাওয়া গেছে যা শুধু তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ নয়, কাজের কথাও বলেছে। তখন আমার সাথীরা বললেন, 'তুমি যাও, এবিষয়ে তাঁদের উপদেশ নাও যা আমাদের কাজে আসে।' সেজন্যই আমি এসেছি।[1]

তাঁদের সমাজের বৈপ্লবিক আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তারিত বক্তব্য রাখার পর মীরা তাঁকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ত্যাগ করতে বললেন :

> শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দিও না, তাদের কাছে নিষ্পাপ হয়ে ওঠ, ন্যায়বিচার, সততা, স্থৈর্যশীল সাহসের দৃষ্টান্ত তুলে ধর। তখনই দেখবে, জয় তোমার করায়ত্ত কারণ তখন সত্য তোমার সাথী। শুধু লক্ষ্যেই নয়, পদ্ধতিতেও এই সত্যের প্রতিষ্ঠা হবে।[2]

এ কথায় সেই ব্যক্তি শান্ত হলেন এবং গোষ্ঠীর সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলে গেলেন। কিন্তু এই যুবকের পরবর্তী ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ প্যারিসে তাঁর পেছনে গুপ্তচর লেগেছিল এবং তিনি বিপ্লবের তরঙ্গে উত্তাল রাশিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন।

মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে গোষ্ঠীতে আলোচনা হত। সময়ে সময়ে একসাথে অনেক উপাখ্যান সভায় পড়া হত। সৎ গণাবলী বিষয়ে রচিত এক উপাখ্যান এখনো রয়েছে। সত্যের প্রাসাদের কাছে অবস্থিত বুদ্ধির হল-এ অনুষ্ঠিত

---

1. *Words of Long Ago*, পৃ: 8
2. ঐ, পৃ: 12

এক ভোজসভা এর বিষয়বস্তু। সৎ গুণাবলী 'যা বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে, বিচ্ছিন্ন সব জীবনের মধ্যে তা এত নিঃসঙ্গ', কিছুক্ষণের জন্য তা একত্রিত হোল। নিষ্ঠা 'যার হাতে ছিল স্বচ্ছ কোণাকৃতি এক পদার্থ যার মধ্য দিয়ে সবকিছু দেখা যায়' ; বিনয় 'যা একই সাথে সশ্রদ্ধ ও অহঙ্কারী' ; সাহস 'এক অদ্ভুত ভঙ্গি নিয়ে হাসছে' ; বিজ্ঞতা, 'একেবারেই অবগুণ্ঠিত' ; উদারতা 'একই সাথে সতর্ক ও শান্ত, সক্রিয় অথচ বিচক্ষণ'; এবং অন্যান্য গুণাবলী, যেমন ন্যায়বিচার, দয়া ও স্থৈর্য, বিরাজমান। শেষে একজন এল যাকে দেখে মনে হল গুণাবলীর সমাবেশে যেন বহিরাগতা :

> খুবই কমবয়সী ও দুর্বল প্রকৃতির, সাদা পোষাক পরিহিতা, খুব সাদাসিধে ও বেশ গরীব। ত্রস্ত পায়ে বেশ অপ্রতিভ ভঙ্গিতে তিনি এলেন। এত সব মহান গুণাবলীর সমাবেশ দেখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হয়ে থেমে পড়লেন, কার কাছে যেতে হবে বুঝতে পারলেন না।[1]

শেষে প্রাজ্ঞ এগিয়ে এসে অপ্রতিভ নিমন্ত্রিতের কাছে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। নবাগতা একটু হাঁফ ছেড়ে বললেন :

> 'হায়! এই প্রাসাদে আমি বহিরাগতা প্রতিপন্ন হয়েছি দেখে আশ্চর্য হই নি। খুব কম ক্ষেত্রেই আমি নিমন্ত্রিত হই। আমার নাম কৃতজ্ঞতা।'

এই সময়ে এক মহিলা-সংগঠনের সভায় মীরা চিন্তা-বিষয়ক এক বক্তৃতা দেন। চিন্তার বিন্যাস, কীভাবে চিন্তা নিয়ন্ত্রণ এমনকি কঠোরভাবে বশে আনা যায়, তার সম্বন্ধে এক পথনির্দেশ দিয়ে এই বক্তৃতা শেষ হয় এইভাবে :

> আমি মনে করি, সর্বোত্তম আলোকবর্তিকা, সূর্যসত্যে উপনীত হবার পথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবনসূত্র সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে আমরা দৈনন্দিন জীবনেই আত্মোন্নতির সঙ্কল্প নিতে পারি। আমাদের মন ও হৃদয়ে তা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে সমস্ত চিন্তা ও কর্মধারাকে উদ্দীপ্ত করে।[2]

'কীভাবে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়' নামে রচনায় কিছু ব্যক্তিগত ভাব রয়েছে :

---

1. *Words of Long Ago*, p. 18
2. ঐ, পৃঃ 29

> গভীর দুঃখের বোঝায়, প্রবল যাতনার সমুদ্রে পড়ে আমার হৃদয় কেঁদে উঠেছে......আমি আপনার—সর্বাধিপতি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছি। আমি আন্তরিক প্রার্থনা করেছি এবং আপনার মহান আলোকবর্তিকার ঔজ্জ্বল্যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছি।[1]

এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যখন অসময়ে এই ধরণের প্রার্থনাসভার মাধ্যমে তিনি পরম সান্ত্বনা পেয়েছেন। প্যারিসের এক মাথাধরানো কোলাহলমুখর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মীরা স্বর্গীয় মহিমায় মূর্ত এক মহিলার সাক্ষাৎ পান। এই ধরাধামে যখন আনন্দ ও সৌন্দর্যের বহু উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে তখন ব্যক্তিগত হতাশার গহ্বরে পড়ে নিজের আত্মাকে একজন হারিয়ে ফেলবে কেন? অভিজ্ঞ দৃষ্টি ও শ্রুতিবোধের সাহায্যে একজন আনন্দময় চেতনাকে অনুভব করতে পারে। আর একদিন, ইতালীর এক নির্জন গীর্জায় অর্গান বাজাতে বাজাতে মীরা সঙ্গীতের আনন্দময় লহরীতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। এই ধরণের আধ্যাত্মিক ভাব সমাজের চাহিদানুগ ছিলনা, এবং সময়ে সময়ে মীরা অসঙ্গতি ও অস্বস্তিবোধও করতেন।

শ্রীঅরবিন্দ

1910 সালে মীরা আধ্যাত্মিক অন্বীক্ষায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। স্বামী মরিসেটের সাথে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল এবং পরে পল রিচার্ড নামে এক আধ্যাত্মিক অন্বেষকের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর সমগ্র সত্তায় এক প্রশান্তি নেমে আসে, আত্মার গভীরে এই ভাব নিরবচ্ছিন্ন রূপ নেয়। এবং এর কিছুদিনের মধ্যেই Cosmique গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।

1910 সালে পল রিচার্ড নির্বাচনের কাজে যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন মীরা 'ডেভিডের নক্ষত্র' সংজ্ঞাটির কী অর্থ, তা জানার জন্য কোনো সাধকের শরণাপন্ন হতে বলেন। তিনি এটা অনুভব করেছিলেন, যিনি এই চিহ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন তাঁকেই গুরু হিসাবে মেনে নেবেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি রিচার্ড পণ্ডিচেরী

---

1. ঐ, পৃঃ 41

পৌঁছন এবং সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী কবি এবং যোগী, যিনি ব্রিটিশ ভারত থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে ছিলেন, সেই শ্রীঅরবিন্দের কাছে যান।

1872 সালের 15 আগস্ট কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের জন্ম। তাঁর বাবা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন ইংরেজভাবাপন্ন। কাজেই শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা হয় ইংলণ্ডে। প্রথমে সেন্ট পলস স্কুল, পরে কেমব্রিজের কিংস কলেজে। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। 1890 সালে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু অশ্ব-চালনার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ভারতে ফিরে বরোদায় 13 বছর কাজ করেন—আমলা, অধ্যাপক ও শেষে বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসাবে। তিনি প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটক লেখা শুরু করেন এবং জাতীয়তাবাদের ওপর অগ্নিগর্ভ রচনা দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করেন। 1905 সালে রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঘটে, 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার সম্পাদক হন এবং 1908 সালে দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হন। মামলা চলাকালে এক বছর আলিপুর জেলে বন্দী থাকেন। জেলে বন্দী থাকাকালেই সর্বসত্তাময় নারায়ণ-এর দর্শন পান। 1909 সালে মুক্ত হন, সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে না গিয়ে তিনি 1910 সালের এপ্রিলে পণ্ডিচেরী গিয়ে সেখানে যোগ ও কারাবাসকালে যে সর্বময় সত্তার প্রকাশ দেখেছিলেন, তার ক্রমবিকাশে আত্মনিয়োগ করেন। 1910 সালে পণ্ডিচেরী সফরকালে রিচার্ড শ্রীঅরবিন্দের সাথে দেখা করেন। তিনি 'ডেভিডের আলো'-র সঠিক ব্যাখ্যা করে দেন :

> এই প্রতীক ভগবদসত্তার চেতনা-প্রকাশের উৎস স্বরূপ ; সূর্যরশ্মির উষ্ণতা থেকে এই আকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং পুষ্পদলের মতো প্রস্ফুটিত হয়, চেতনার নিম্নস্তরের এই আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের করুণা লাভে ধন্য হয়। যোগসাধনা ও সিদ্ধির সব নিগূঢ়ার্থ ও অলৌকিক তত্ত্ব এই প্রতীকে মূর্ত।[1]

রিচার্ড শ্রীঅরবিন্দকে "ভবিষ্যতের নেতা" হিসাবে চিনতে পেরেছিলেন ; দেখেছিলেন, "স্বয়ং শিব মূর্ত হয়েছেন তাঁর মধ্যে।" রিচার্ড ফ্রান্সে ফিরলে মীরা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সব জানলেন। এরপর থেকেই তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সাথে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করতেন। শ্রীঅরবিন্দও শিষ্যদের কাছে প্যারিসে দীক্ষিতা এই মহীয়সী ফরাসী মহিলার কথা বলতেন। এপ্রিল 1914 সালে তিনি মতিলাল রায়কে লিখছেন :

---

1. কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের *On The Mother* থেকে

> শ্রী ও শ্রীমতী রিচার্ড ইউরোপীয় যোগীদের মধ্যে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে ও অন্যান্য বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। গত চার বছর ধরে পার্থিব বিষয়ে ও আধ্যাত্মিক স্তরে তাঁদের সাথে আমার পত্রালাপে যোগাযোগ রয়েছে।[1]

অন্যদিকে প্যারিসের 'কসমিক' গোষ্ঠী এই পত্রালাপ থেকে উপকৃত হত। এই গোষ্ঠী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহিত ছিল এবং মীরা সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন :

> একটি বিষয়বস্তু ঠিক করে দেওয়া হল ; পরের সপ্তাহে একটা উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকেই সাথে ছোট কাজ করে আনতেন, আমিও ছোট আকারে লিখিত রচনা আনতাম এবং শেষে পড়তাম।[2]

7 মে, 1962 তারিখে মীরার বিবৃতিতে এই গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত :

> বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিবর্তমান ঐক্যতান দর্শনই মূল লক্ষ্য হিসাবে গণ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে এই পৃথিবীতে যে পথ নেওয়া হবে তা হোল, অন্তরে স্থিত একমেব ভগবদসত্তার স্বরূপ-প্রকাশ সম্বন্ধে চেতনার মাধ্যমে সার্বিক মানবঐক্য স্থাপন।
>
> অন্য কথায়, যিনি আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছেন, সেই সর্বমেব ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐক্য সৃষ্টি।[3]

আধ্যাত্মিক রোজনামচা

এই লক্ষ্য সাধনে উপযুক্ত কেন্দ্রে এক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মীরা শ্রীঅরবিন্দের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজছিলেন। সাক্ষাতের প্রস্তুতি হিসাবেই যেন তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে রোজনামচা লিখতে শুরু করলেন, পরে তা প্রকাশিত হয়

1. *Centenary Edition*, সংখ্যা 27, পৃ: 442
2. *Bulletin*, এপ্রিল 1972, পৃ: 47
3. *Words of the Mother* (1946) পৃ: 5

Prayers and Meditations of the Mother নামে। রোজ প্রত্যূষে উঠে ঘরে জানলার ধারে গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে তিনি ধ্যান করতেন। কিছুক্ষণ পরে সব চিন্তাভাবনা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, অনুভূতি, স্বপ্ন ও কল্পনা স্বচ্ছ ফরাসীতে লিখে ফেলতেন। প্রায় দু দশক ধরে তিনি এইভাবে রোজনামচা রাখতেন। এর কিছু নির্বাচিত অংশ পরে প্রকাশিত হয়, অন্যগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়ে যায়। কারণ তাঁর *Prieres et Meditation* ফরাসী সাহিত্যে ক্লাসিক হিসাবে গণ্য এবং ফরাসী কবি বলেছেন, 'নিখুঁত ফরাসী আঙ্গিকের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।' এর ইংরাজী সংস্করণটিও প্রশংসাধন্য, এবং এর অনেকগুলির অনুবাদই শ্রীঅরবিন্দ নিজে করেছিলেন বলে অনেক সুবিধা হয়েছে।

Prayers and Meditations-এ একজন সাধক ঈশ্বরের কৃপার জন্য অপেক্ষারত, সেই চরম মুহূর্তের জন্য তাঁর মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। কার্যতঃ এক্ষেত্রে মীরা নিজের সত্তা ও লৌকিক চেতনার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কথা বলেছেন। ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়ার মুহূর্ত আসে, এতে ইহজগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হন :

> আজ সকালে (26 নভেম্বর) যে-চেতনার উপলব্ধিতে অনুভব করেছি কীভাবে আপনি আমার সত্তায় রয়েছেন, এর স্বরূপ বোঝাতে জ্যামিতিক আকারের হীরকখণ্ডের উদাহরণ দেওয়া যায় : সংহতিপূর্ণ, সুদৃঢ়, নীরেট স্বচ্ছতায় সম্পূর্ণ এবং তার মধ্যে এক উজ্জ্বল আলোকপ্রভার প্রকাশ......আপনি সর্বত্রগামী ও সর্বব্যাপী ; সত্তা ও প্রকাশে আপনার সর্বময় অস্তিত্ব ছাড়া কিছু নেই।[1]

তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তার বিকাশ ক্রমশঃ স্থায়ী রূপ পেল এবং নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান করে অস্তিত্বের স্বরূপ বিকশিত হোত। ভগবদ্‌সত্তার প্রতি তাঁর অনুভূতি তীব্র হওয়ার সাথে সাথে লৌকিক চেতনার স্তরে তা ব্যবহার করার ইচ্ছা দেখা দিল।

> আমাদের সত্তার একাংশ নিষ্কলুষ এই জ্ঞান, এবং এর সাথে যোগসূত্র স্থাপনের উপযোগিতা থাকে যদি আমরা এই জ্ঞান লৌকিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি।[2]

---

1. *Prayers and Meditations* (1948) পৃঃ 4
2. ঐ, পৃঃ 15

মীরা ভালোভাবেই জানতেন যে মহাজাগতিক নিষ্ক্রিয়তার বিশাল আবর্তে থেকে এই অন্ধকারময় পৃথিবীর পরিবর্তনের জন্য অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে :

> কৃপা করুন প্রভু, আমি যেন আলোকদানকারী, উষ্ণতাপ্রদায়ী অগ্নি হতে পারি, তৃষ্ণা নিবারণকারী ঝরনার মতো যেন হই, আশ্রয়দানকারী ও সুরক্ষাকারী বৃক্ষের মতো যেন হতে পারি......মানুষ এত অসুখী, অজ্ঞ, তাদের অনেক সাহায্য দরকার !

যখন মীরা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে যাতনা পান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে আনন্দ পান, তখন 1913 শেষ হয়ে আসছে। বিশ্বময় অস্থিরতার মেঘ দেখেই যেন আশার ওপর ভর করে বললেন, 'আরো মহনীয় আলোয়, আরো নিষ্কলুষ মমতা এবং অকৃত্রিম ভালোবাসায় নতুন বছর 1914 সালে দিগন্তলোক-উদ্ভাসিত হবে।' জানুয়ারী 7, 1914 সালে তিনি প্রার্থনা করলেন :

> সবার মনে শান্তি দাও, আলো দেখাও, হে প্রভু, এদের অন্ধ দৃষ্টি খুলে দাও, অর্থহীন যাতনা ও অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ থেকে মুক্তি দাও।
> ওঃ, সব অশ্রু মুছে যাক, সব দুঃখের অবসান হোক, সব যাতনা দূর হোক এবং সবার হৃদয়ে শান্ত সমাহিত ভাব বিরাজ করুক এবং বলিষ্ঠ নিশ্চয়তায় সবার মনোবল দৃঢ় হোক।[1]

ভারতের পথে যাত্রা

পল রিচার্ডের মতো বিশেষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী লোকের সাথে বিবাহিত হয়ে এবং নিজে নীচতায় ভরা ফরাসী সমাজের সদস্যা হয়ে মীরা দুঃখ ও উদ্বেগের সাথে চারপাশের জীবন অবলোকন করতেন। 1914 সালের খতিয়ানে এর জন্য মমতা ও করুণা প্রকাশ পায় :

---

1. ঐ, পৃঃ 37

> অলৌকিক সব ব্যক্তিত্বের আবর্তের মধ্যে, এই বহুবিচিত্র জটিলতাপূর্ণ সংঘাতময় চিন্তাভাবনার চাপের মধ্যে টানাপোড়েন ও আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আমার কাছে দুঃসহ মনে হয়। এই বিক্ষোভের সমুদ্র থেকে আমাদের উঠে আসতেই হবে, পৌঁছতে হবে আপনার শান্তির পারাবারে...হে প্রভু, অজ্ঞতাকে নির্বাসন দিতে হবে, কল্পনা ত্যাগ করা দরকার এবং এই যাতনাময় বিশ্বকে বর্তমানের দুঃস্বপ্নময় রাত্রি থেকে উদ্ধার করতে হবে।[1]

ঈশ্বরের কাছে তাঁর ক্রমাগত প্রার্থনায় তিনি যেন জীবনের ক্লেদ ও গ্লানি মুক্ত করার মাধ্যম হয়ে ওঠেন :

> হে ঈশ্বর, আপনার কাছে অনুনয় করি, আমাকে সর্বদুঃখহরণকারী জ্বলন্ত অগ্নির আধার করে তুলুন এবং তা যেন এক আনন্দময় আলোকরশ্মি হয়ে সবার হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হয়।[2]

এই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মীরা ভারত-ভ্রমণের প্রস্তুতি নেন। ভ্রমণের খরচ যোগাতে তিনি তাঁর সামান্য সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ফ্রান্সে বিক্রি করে দেন। পলের উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য প্যারিসের সংসদে ভারতে ফ্রান্স অধিকৃত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি-নির্বাচনে দাঁড়ান। মীরার কাছে ভারত-সফর ছিল প্রকৃত মাতৃভূমি দর্শন। তাঁরা প্রথমে জেনেভা গেলেন এবং জাপানী জাহাজ কাগামারু চেপে রওনা হলেন। জাহাজের কর্মচারী ও যাত্রীদের সাথে মীরার অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। জাহাজটি ছিল :

> যেন এক শান্তির নীড়, আপনার সম্মানে নিবেদিত এক ভাসমান মন্দির। অবচেতনের ঢেউ পেরিয়ে আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব অনুভবে সমৃদ্ধ হচ্ছে।[3]

একটা চাপা আনন্দ রয়েছে, কারণ তিনি এমন এক দেশে যাচ্ছেন যার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। ইতিমধ্যেই কিছু ভারতীয় শাস্ত্র তিনি পড়েছেন। বাচ্চা বয়স থেকেই ভারতীয় উপকথা ও অতিকাহিনী তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের কিছু আহাম্মক ব্যক্তি তাঁকে আলোর নতুন দিশা অন্বেষণ করতে

---

1. *Prayers and Meditations*, পৃঃ 57–58
2. ঐ, পৃঃ 48
3. ঐ, পৃঃ 71

বলেছিলেন। জাহাজে এক পাদ্রী খ্রীস্টীয় আচারানুষ্ঠানে যোগদান না করার কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে পরিষ্কার বলে দেন :

> আপনারা সৎনিষ্ঠ বলে আমি মনে করি না, আপনাদের দলের কেউই নন। এক সামাজিক দায়িত্ব ও দেশাচার পালনে আপনারা এই কাজে এসেছেন, ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়ার ইচ্ছায় নয়।

যেসব খ্রীস্টান মিশনারী প্রাচ্যে মানুষকে ধর্মান্তরীকরণের জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে মীরা সোজাসুজি বলেছেন :

> শুনুন, আপনাদের ধর্মের উদ্ভবের—এর বয়স দু হাজার বছরও হয়নি—আগেও চীনাদের এক উচ্চতর মহান দর্শন ছিল এবং তাঁরা জানতেন আধ্যাত্মিকতা লাভের পথ কী ; পশ্চিমীদের তাঁরা অসভ্য বলে মনে করতেন। আর আপনারা সেখানে যাচ্ছেন ধর্মান্তরীকরণ করতে, যাঁরা এ বিষয়ে আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি জানেন ! তাঁদের কী শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন ? অসৎ হতে, এক গভীর দর্শন অনুসরণ না করে এবং ত্যাগী জীবনযাপন করে আধ্যাত্মিক চেতনা-সম্পন্ন না হয়ে এইসব অন্তঃসারশূন্য আচার পালন করতে বলবেন তাঁদের ?[1]

রিচার্ডরা কলম্বোয় অবতরণ করে তালাইমান্নার থেকে নদী পার হয়ে ধনুষ্কোটি পৌঁছলেন ; 28 মার্চ নৌকায় উঠে, ভিল্লুপুরমে নৌকা বদল করে পণ্ডিচেরী এলেন 29 মার্চের ভোরে। মীরা শহরের কেন্দ্রস্থলে এক মহান আলোকবর্তিকা দর্শনের দুজ্ঞে'য় দৃষ্টি লাভ করলেন এবং স্টেশনে নামার পর সেই আলোর তীব্রতা বাড়ল।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ

যে-সময়ের কথা বলছি, তখন শ্রীঅরবিন্দ 'মৌন যোগ ক্রিয়া' অভ্যাস করছিলেন, সূক্ষ্ম চেতনার প্রসারে এক নতুন মাধ্যম রচনা করছিলেন। টাকার অভাব ও ব্রিটিশ

---

1. *Questions and Answers* (1956), পৃ: 132–33

পুলিশের অত্যাচার, এই দুয়ের মাঝে পড়ে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর শিষ্যরা আধ্যাত্মিকতার অন্বেষণে নিবেদিত এক অসমসাহসিক জীবন যাপন করছিলেন। এর মাঝেই চারদিকে রটে যায় যে "দুজন ইউরোপীয় শ্রীঅরবিন্দকে গুরু হিসাবে মেনে নিয়েছেন...ফ্রান্সের উচ্চ মহলের দুই ব্যক্তি......শ্রীঅরবিন্দের কাছে আসছেন যোগ শিখতে।"[1]

1914 সালের 29 মার্চ, যেদিন তাঁরা পণ্ডিচেরী পৌঁছন, সেদিনই বিকেল সাড়ে তিনটায় 37, Rue Francois Martin-এ তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সাথে দেখা করেন। মীরা ও শ্রীঅরবিন্দ, প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পরকে চিনতে পেরেছিলেন। মীরার দিক থেকে এটা ছিল ক্ষণিকেই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। কে. ডি. শেঠনা বলছেন :

> শ্রীঅরবিন্দের সাথে দেখা হওয়ার আগে...বিশ্বের উন্নতির জন্য যত উচ্চতম আদর্শ তাঁর মনে ছিল—শৈল্পিক, সামাজিক, ধর্মীয়—শ্রীঅরবিন্দকে দেখা মাত্রই সেসব ভাবনাচিন্তা ছেড়ে সম্পূর্ণ নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা মীরার মনে এল। মীরা কোনো কথা বললেন না। শুধু শ্রীঅরবিন্দের পায়ের কাছে বসলেন এবং চোখ বুঁজে তাঁর কাছে মনপ্রাণ নিবেদিত করলেন। কিছুক্ষণ পরে এক নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা তাঁর মনে অবরোহণ করল।[2]

মীরা নিজের জায়গায় ফিরে বুঝলেন যে তাঁর মধ্যে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে এবং সেজন্য ঈশ্বরের কাছে নিজেকে পুনঃসমর্পণ করলেন। পরের দিন রোজনামচার খাতায় এই অবিস্মরণীয় উক্তি লিখলেন :

> শত সহস্র সত্তা অসীম অজ্ঞতার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকলে কিছু যায় আসে না। কাল যাঁকে দেখলাম তিনি এই ধরাধামেই আছেন ; তাঁর উপস্থিতি এটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট যে এমন একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোয় রূপান্তরিত হবে, যখন তাঁর শাসন এই পৃথিবীতে কায়েম হবে।[3]

এটাই নবযুগের প্রেক্ষাপট। আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতায় আকাঙ্ক্ষিনীর কাছে এ এক নবজন্ম। শ্রীঅরবিন্দের সাথে সাক্ষাতের কিছুদিনের মধ্যেই মীরা তাঁর পত্রিকায় লিখলেন :

---

1. Nalini and Amrita, *Reminiscences* পৃ: 164–65
2. *The Flame of Truth* (1968), স. V.K. Gokak ও V. Madhusudan Reddy, পৃ: 48–49
3. *Prayers and Meditations*, পৃ: 88–89

মনে হচ্ছে যেন নতুন জীবন পেয়েছি, অতীতের সব আচার-রীতি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এটা আমার শুধু মনে হচ্ছে যে এতদিন যা ছিল শেষ পরিণতি এখন তা কেবলমাত্র প্রস্তুতি...অতীতের সবকিছু থেকে যেন আমি বেরিয়ে এসেছি, ভুল ভ্রান্তি, সাফল্য, সব উবে গিয়ে নবজীবনের উদয় হয়েছে যেন, যার পরিপূর্ণ সত্তা এখনো বিকশিত হয়নি...হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাবোধ আসার সাথে সাথে মনে হচ্ছে আমি সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দ্বার-প্রান্তে উপনীত।[1]

নির্বাচনে পল রিচার্ড ব্যর্থ হলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে দুর্নীতি সহায়ক হল। রিচার্ড আরো দু'বছর পণ্ডিচেরী থেকে 'বৈদান্তিক যোগ'-এর প্রসারে কাজ করেন। রাজনীতির জীবন থেকে সরে এসে রিচার্ডরা শ্রীঅরবিন্দের সহযোগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বৈদান্তিক যোগ প্রসারে সযত্ন হলেন।

রোজ সন্ধ্যায় সভা হত, রিচার্ডরা মিষ্টি হাতে করে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ী যেতেন। মীরা মাঝে মাঝে শ্রীঅরবিন্দের জন্য কোকো বানিয়ে নিয়ে যেতেন। প্রতি রবিবার শ্রীঅরবিন্দ শিষ্যদের নিয়ে রিচার্ডদের বাড়ী গিয়ে খাওয়া দাওয়া করতেন। অমৃত নামের এক যুবক সেই প্রথম দিকেই মীরার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। সপ্তাহে দু'বার মিলিত হয়ে তাঁরা যৌগিক সাধন-পাঠ করতেন। অমৃতের কথায় :

যখনই তাঁর কাছে গেছি, মনে হয়েছে এক অপরিসীম শক্তি ভবিষ্যতের মার মধ্যে মূর্ত। তিনি অবশ্য এর কিছুমাত্র প্রদর্শন না করে নিজের মধ্যেই ধারণ করতেন। কোন কোন সময়ে এই শক্তি অপ্রতিহতভাবে প্রজ্জ্বলিত হোত। আমাদের অন্তর্দৃষ্টি সজাগ থাকলে এই বিকিরণ দেখা যায়।[2]

সহযোগ

অন্তরের ও বাইরের এই বিকিরণের পরিবেশে মীরা মানবিক ও জাগতিক পটভূমি রূপান্তরের দায়িত্ব নিলেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিজেকে সম্পূর্ণ করে তোলার

1. ঐ, পৃ: 90–91
2. *Reminiscences*, পৃ: 180

পালা। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের মেজাজে তিনি তা করেছিলেন এবং *Radha's Prayer*-এ সেকথা লিখেছেন :

> হে প্রভু, প্রথম দর্শনেই যাঁকে আমার ঈশ্বর ও প্রভু বলে মনে হয়েছে, আমার নিবেদন গ্রহণ করুন।
> আপনিই আমার সব চিন্তা, সব আবেগ, জীবনের সবকিছু, আমার সমগ্র দেহাংশ, রক্তের প্রতিটি কণায় আপনি বিরাজমান। সামগ্রিকভাবে এবং মিলিত হয়ে আমার সমগ্র সত্তাই আপনি। নির্দ্বিধায় বলি, আপনিই আমার সর্বময়। আপনি আমায় যেভাবে ইচ্ছা করেন আমি তাই হয়ে উঠব। আমার জীবন বা মৃত্যু, সুখ বা দুঃখ, আনন্দ বা যন্ত্রণা, যাই আপনি ইচ্ছা করেন, আমি তাই মেনে নেব। আপনার সব করুণাই আমার কাছে মহান ঐশ্বরিক উপহার হয়ে সার্বিক আনন্দ দেবে।

মীরা সংস্কৃত ও বাংলা শিখতে শুরু করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বেশ অগ্রসর হলেন। কারাইকল সফরকালে তিনি মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণার অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু কিছুতেই নিরুৎসাহ হলেন না। 1914-এর 13 এপ্রিল কারাইকল সম্বন্ধে রোজনামচায় লিখছেন : 'চারদিকের সবকিছুই সুন্দর, ঐকতানময় ও শান্ত, সবকিছুতেই যেন আপনি বিরাজমান।' একটানা ভ্রমণের ঝক্কি, নতুন সব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার চাঞ্চল্য এবং পলের নির্বাচনী প্রচারের ঝামেলা, এইসবে শরীর ভেঙে পড়ে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মনে হয় যেন 'আমার আধ্যাত্মিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ছে, সর্বশক্তিমান একমেব সত্তা অনুভবের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে।'[1]

সৌভাগ্যবশতঃ শীঘ্রই সেরে উঠে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কেমন যেন মনে হতে থাকল যে পৃথিবীর সাথে এক হয়ে গেছেন এবং ঐশ্বরিক সত্তা তাঁর মধ্যে অবরোহণ করেছেন। নানা কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি, কী করতে হবে সেবিষয়েও তাঁর মন পরিষ্কার ছিল :

> এক বিরাট সৃষ্টিকর্ম করতে হবে, নতুন কর্মধারা ও নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে, যাতে পৃথিবীতে অজ্ঞাত এই শক্তি যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ পেতে পারে। এই নবজন্ম সৃষ্টির কর্মযজ্ঞে আমি নিবেদিত, হে প্রভু, আপনিই ত আমাকে

---

1. ***Prayers and Meditations***, পৃঃ 105

> দিয়ে এ কাজ করাতে চাইছেন। কিন্তু যেহেতু কাজের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন, সেজন্য সে কাজ করার সঙ্গতি আমায় দিতে হবে।[1]

তাঁর কর্মপ্রয়াসের প্রথম ফলশ্রুতি *L'Idee Nouvelle* ('নতুন আদর্শ') নামে এক সংস্থার জন্ম। এতে একটি পাঠাগার ও পড়ার ঘর ছিল। সংস্থার সভ্যরা প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধ্যান করতেন, আত্মোন্নয়নেও কিছু সময় দিতে হত। দ্বিতীয়তঃ, রিচার্ড ও শ্রীঅরবিন্দ মিলে একটি মাসিক পত্রিকা 'আর্য' প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। একটি ফরাসী সংকলন প্রকাশের কথাও হোল : *Revue de la Grande Synthese.* শ্রীঅরবিন্দ বেদ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা-সমৃদ্ধ রচনা লিখতেন, বিশ্ব-দর্শনের সামগ্রিক চিন্তা-সমন্বিত রচনাও লিখতেন এই পত্রিকায়। পল রিচার্ড মহান সাধক ও চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি সংকলন করে তুলে দিতেন। ব্যবস্থাপনার কাজ ছাড়াও মীরা শ্রীঅরবিন্দর রচনা ফরাসীতে অনুবাদ করার কাজে পলকে সাহায্য করতেন। পণ্ডিচেরীর মডার্ন প্রেস-এ কাগজ ছাপা হোত। 1914 সালের 28 জুন হাপসবুর্গ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্রাটের হত্যার পরিণামে সারা বিশ্ব যুদ্ধের দাবানলে বিধ্বস্ত হলেও 15 আগস্ট 1914 তারিখে *Arya* ও *Revue* তমসাচ্ছন্ন মানবসভ্যতার কাছে প্রভাতের আলোকরশ্মি নিয়ে আবির্ভূত হোল। আর্য-র প্রথম সংখ্যার মলাটে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখা ছিল :

> (1) অস্তিত্বের সংকটময় সমস্যাবলী নিয়ে সংগঠিতভাবে গবেষণা করা; এবং (2) মানবতার বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধন করে জ্ঞানের এক সংশ্লেষময় ভাণ্ডার গড়ে তোলা। এর পদ্ধতি হবে বাস্তববাদী, একই সাথে যুক্তিসিদ্ধ ও অলৌকিক, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং সহজাত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের ভিত্তিতে এই বাস্তববাদ গড়ে উঠবে।

---

1. ঐ, পৃঃ 135

ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন

দর্শন ও আধ্যাত্মিক জগতের স্বর্গে রিচার্ডরা এবং শ্রীঅরবিন্দ নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নি। বিশ্বব্যাপী তুমুল আলোড়নের বিষয়ে তাঁরা অবগত ছিলেন এবং কার্যতঃ 'আর্য' পত্রিকা এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা স্বরূপ। মীরার রোজনামচায় সেইসব দিনের হতাশা, প্রার্থনা ও আশার কথা বিধৃত আছে :

> হে প্রভু, এই পৃথিবী দুঃখ যাতনায় কাতর ; অরাজকতা যেন স্থায়ী আসন পেতেছে।
> চতুর্দিকের তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ এত গভীর যে আপনি একা তা দূর করতে পারবেন না। আসুন, নিজেকে প্রকাশ করুন, যাতে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।[1]

কিন্তু এই বিধ্বংসী আবহাওয়ার মধ্যেও মীরা সৃজনধর্মী আন্দোলনের দিশা পেয়েছেন :

> এই ভয়াবহ অরাজকতা ও ধ্বংসের মধ্যেও বিশাল কর্মধারা সক্রিয় রয়েছে, কঠোর পরিশ্রম দিয়ে পৃথিবীকে নবজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে, যা সময়ে সোনার ফসল ফলাবে এবং এক নতুন জাতির কর্মফলে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে তুলবে......এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।[2]

চেতনার স্তর সম্বন্ধেও মীরা সচেতন ছিলেন, এর কোনটা উজ্জ্বল এবং কোনটা আবছা যার মধ্যে বিশ্বের সব দুঃখ, সংগ্রাম নিহিত আছে তা জানতেন। তিনি এ বিষয়েও নিশ্চিত ছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্যে এক নতুন বিশ্বের দ্বার মানুষের কাছে খুলে দেওয়া যাবে :

> আমরা প্রচণ্ডভাবে চাইছিলাম যে ভগবদপ্রেমের আলো বিকশিত হোক, এইসব বিক্ষিপ্ত উপাদানের কেন্দ্রে এটা এক পরির্তনকারী শক্তিস্বরূপ...... আমরা জানতাম যে পৃথিবী রক্ষা পাবে।[3]

1. *Prayers and Meditations*, পৃ: 180
2. ঐ, পৃ: 182–83
3. ঐ, পৃ: 184–85

মীরার দুর্জ্ঞেয় চেতনাবোধ তাঁকে সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর ধারিকাশক্তি করে তুলেছিল। কোনো ঘটনার আগেই তিনি তা দেখতে পেতেন, যেমন প্যারিসের বিপদের ঘটনা তিনি 1914 সালের সেপ্টেম্বরেই দেখেছিলেন। পলকে রিজার্ভ আর্মিতে যোগ দিতে হবে, কাজেই মীরাকে এখন ফ্রানসে ফিরতে হবে। এর অর্থ, ফরাসী পত্রিকা *Revue de la Grande Synthese*-এর প্রকাশনা বন্ধ হবে। এমনকি আর্য-র প্রকাশেও বহু অসুবিধা দেখা দিল। যদিও *Revue* মাত্র সাত সংখ্যা বেরিয়েছে, এরই মধ্যে এই পত্রিকা ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের লেখার অনুবাদগুলি। এক সংবাদদাতাকে দেওয়া শ্রীঅরবিন্দের শুভেচ্ছাবার্তাও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও সহজবোধ্য :

> আমার বর্তমান শিক্ষা হচ্ছে, বিশ্ব এক নতুন প্রগতি, এক নয়া বিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যে দেশ, যে জাতি এই নয়া বিবর্তনধারা অনুসারে তা পূরণ করতে পারবে, তারাই মানবজাতির নেতৃত্ব দেবে। আর্য-তে আমি কোন চিন্তার ভিত্তিতে এই নয়া বিবর্তনকে দেখছি এবং কোন রীতির যোগবলে একে অর্জন করা যাবে তা বলেছি।[1]

রিচার্ডরা ফিরে যাবার পর শ্রীঅরবিন্দ একা আর্য-র 64 পৃষ্ঠায় এই মহান বাণী লেখার দায়িত্ব বহন করেন। তবে নির্বিঘ্নে এই কাজ তিনি করতে থাকেন, কারণ ফ্রান্স সরকারের ওপর মীরার ভাইয়ের প্রভাব ছিল, তিনি শ্রীঅরবিন্দের স্বার্থরক্ষায় সাহায্য করেছিলেন।

21 ফেব্রুয়ারী, 1915 সালে 37তম জন্মদিবস উদযাপনের পর মীরা কাগামারু জাহাজে ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করেন। পণ্ডিচেরীর আধ্যাত্মিক আনন্দ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মধারা ছেড়ে এসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী পরিবেশে মীরার লক্ষ্যপথ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে :

> নিঃসঙ্গতা, তীব্র নিষ্ঠুর একাকীত্ব এবং এক তমসাচ্ছন্ন ভয়াবহ নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ! সময়ে সময়ে...নিঃসঙ্গতার আবর্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ থেকে বিরত থাকতে পারি না এবং সত্তার মধ্যে স্বয়ং প্রভুর শান্ত ও মৌন ভাব মুহূর্তের জন্য এক অনুনয়সূচক প্রার্থনায় পরিণত হয় : হে ঈশ্বর,

1. Centenary Edition, সংখ্যা 27, পৃ: 475

> আমি কী করেছি যার জন্য আপনি আমায় এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাত্রের মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন ?[1]

যদিও আধ্যাত্মিক সুখ থেকে এই নির্বাসন কিছুদিনের জন্য মীরাকে সহ্য করতেই হবে, তবু কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েন নি। এক আধ্যাত্মিক শক্তির জোরই তাঁর মধ্যে এক গর্বিত মেজাজ এনে দিল :

> এই পৃথিবী থেকে পালিয়ে যাওয়া নয় ; কালিমা ও মালিন্যের বোঝা শেষ পর্যন্ত বহন করে যেতে হবে, এমনকি ঈশ্বরের কৃপা না থাকলেও। অন্ধকার রাত্রির হৃদয়ে আমায় থাকতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, এমনকি ভেতরের থেকে কোন দিগ্দর্শন—আলোকবর্তিকা বা পথপ্রদর্শক না পেলেও।[2]

বৈদিক অভিজ্ঞতা

স্বভাবসুলভ আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে মীরা ফ্রান্সের বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত করেন এবং অসুস্থ হবার পর কিছুদিন Lunel-এ থেকে সুস্থ হন। সমুদ্রতীরবত মফঃস্বলের আবহাওয়ায় তিনি বেশ বিশ্রামের মেজাজে ছিলেন। 1915 জুলাই-এর শেষে মীরা Marsillargues-এ ছিলেন। যুদ্ধ ক্রমশঃ ব্যাপক হোল এবং বহু মানুষের মৃত্যু হল৷ তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে মীরার আশা অটুট ছিল, শ্রীঅরবিন্দের সাথে পত্রালাপের গুণেই তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি উদ্বেগের সাথে শ্রীঅরবিন্দের কাছে প্রস্তাব করেন, ব্রিটিশ পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার জন্য আফ্রিকা বা আমেরিকায় চলে আসুন।

6 মে 1915, শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বলেন :

> সারা বিশ্ব এক সামগ্রিক আইনের অধীন, এবং একই আন্দোলনে আলোড়িত, আমি এমন স্থান দেখছি না যেখানে সংঘাত ও সংগ্রাম পিছু নেবে না।

---

1. *Prayers and Meditations*, পৃ: 225–26
2. ঐ, পৃ: 229

যাই হোক, অবসর যাপন আমার ভাগ্যে নেই। প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা বা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগতের মধ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই আমার লক্ষ্য, এই কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমায় বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রাখতেই হবে।[1]

অক্টোবরে প্যারিসে ফিরে মীরা নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিব শক্তির টানা-পোড়েনের অভিজ্ঞতা অনুভব করলেন। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ভণ্ডামী ও হত্যালীলায় মীরা কোন উত্তেজনা অনুভব করেন নি, সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশায় তিনি ব্যথিত হতে থাকেন :

এই দুঃখী পৃথিবী আপনার শরণাগত, হে প্রভু, নিপীড়িত মানবসন্তান মৃত্যুপূর্ব শেষ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আপনার চরণতলে শেষ আশ্রয় প্রার্থনা করছে ; যা ভেঙে পড়ছে তার সবকিছুই আপনার মধ্যে পুনর্জীবন লাভের আশায় রয়েছে, মর্ত্যের মানুষ শেষ প্রগতি হিসাবে আপনার সেই চরম বিধিদানের অপেক্ষায়। শুনুন, প্রভু, দয়া করে শুনুন, এক কাতর কণ্ঠ আপনার কাছে প্রার্থনা করছে...[2]

নিপীড়িত মানবতার দুঃখে মীরা এত সমব্যথিনী হয়েছিলেন যে কোন কোন সময়ে প্রত্যাদেশের মুহূর্ত দেখা দিত। একদিন প্যারিসের এক বাড়ীতে বড় উদ্যানসংলগ্ন প্যাভেলিয়নে সন্ধ্যায় মীরা হঠাৎ অনুভব করলেন, যেন তিনি সমগ্র পৃথিবী ; কোন কিছুই তাঁকে এই সামগ্রিক চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। শ্রীঅরবিন্দকে যখন এই গূঢ় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখলেন, শ্রীঅরবিন্দ 31 ডিসেম্বর 1915 সালে এক উত্তরে বললেন :

আপনি যে-অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন তা প্রকৃত অর্থে বৈদিক। যদিও নিজেদের যৌগিক বলে পরিচয় দেন এমন আধুনিক যোগব্যবস্থায় একে তা বলা হবে না। এটা বেদ ও পুরাণের পৃথিবীর সাথে আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্বের মিলন, যে-পৃথিবী এই পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ দৈহিক সত্তা ও চেতনা, যার প্রতিরূপ হচ্ছে বিশ্ব ও দেহ।[3]

1. Centenary Edition, সংখ্যা 27, পৃ: 424
2. *Prayers and Meditations*, পৃ: 240
3. Centenary Edition, সংখ্যা 25, পৃ: 284

দেহের কম্পনে মীরা কিছুক্ষণের জন্য ত্রস্ত হয়ে পড়েন, যেন দেহের সব তন্ত্রী অবশ হয়ে সারা বিশ্বের সাথে একাত্ম হয়ে উঠল। তারপর ঈশ্বরীয় মাতার আশ্রয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দের জোয়ারে ভেসে রইলেন। কিছুক্ষণ মনে হল, সমগ্র সৃষ্টিই যেন তিনি ধারণ করছেন। এই দেহ পৃথিবী ধারণ করে ভগবদ্‌সত্তায় উপনীত, যিনি স্বর্গচূড়ায় দণ্ডায়মান এবং যে সর্পরজ্জু সারা বিশ্বকে জড়িয়ে আছে অর্থাৎ স্বকীয় সত্তাকে। ওপরের এই আধ্যাত্মিক সত্তা এবং নীচে তিনি একীভূত এক আলোকে পর্যবসিত হলেন। ভগবদ্‌সত্তার সাথে কিছুক্ষণের এই মিলনের পর মীরা সহজেই পার্থিব চেতনায় ফিরে এলেন।

জাপান

ফ্রান্সে একবছর থাকার পর মীরা ও পল জাপানে গেলেন। সেখানে পলের কিছু কাজ ছিল। তবে তাঁরা 'আর্য' ও শ্রীঅরবিন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, এবং সৎ ও কার্যকরী ব্যবসার জন্য পণ্ডিচেরীর তরুণ বন্ধুদের Aryan Stores স্থাপনে মীরা সাহায্য করেন। 1916 সালের এপ্রিলে টোকিও পৌঁছবার আগেই মীরা জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিচিত্র শোভা দর্শন করেন দুর্জ্ঞেয় ক্ষমতাবলে। শিষ্টাচার, সংযম ও মিতাচারে সমৃদ্ধ জাপানী সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি প্রশংসা করেছেন। জাপানী জীবনাচার তিনি বেশ আনন্দের সাথেই রপ্ত করেছিলেন, কিমানো পরা, ইকেবানায় দক্ষতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থানগুলির মধ্যে বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করতেন। একটি ভারতীয় পত্রিকায় তিনি লেখেন :

> এই দেশ মনোরম, বর্ণময় ও বৈচিত্র্যে ভরা, প্রকৃতির কোমলতা, ভয়াবহতা ও সৌন্দর্য বিরাজমান ; বিশ্বের সব দেশের, গরমের দেশ হোক বা শীতের দেশই হোক, নানান বৈচিত্র্যময় দিকগুলি এখানে রয়েছে, কোনো শিল্পীর দৃষ্টিই এর সৌন্দর্য এড়াতে পারে না।[1]

---

1. *The Modern Review*, জানুয়ারী 1918, পৃঃ 69

মীরার নিজের বাগানও ছিল, সেখানে তিনি সব্জী ফলাতেন। সেখানকার মানুষদের কাছে থেকে লক্ষ্য করতেন এবং মনে হত তারা বেশ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, তবে অন্যান্য গুণের দিকও ছিল :

> তাঁরা জানেন কখন চুপ করে থাকতে হয় ; এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতিবোধসম্পন্ন হয়েও তাঁরা খুব কমই তা প্রকাশ করেন। অন্যের জীবন রক্ষায় এঁরা সহজেই প্রাণদান করতে পারেন। আগে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না তাঁরা কত নিঃস্বার্থভাবে তোমায় ভালবাসেন।[1]

যদিও তাঁর জাপানী বন্ধুরা আধ্যাত্মিক শক্তির সীমা অন্বেষণে ব্রতী হন নি, মীরা নিজে জাপান সফরে উপকৃত হয়েছেন। টোকিওতেই তিনি এক রূপান্তরকারী দৃষ্টির অভিজ্ঞতা লাভ করেন :

> ঝলমলে লণ্ঠনে আলোকিত বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত জাপানের এক রাস্তায় যা কিছুই পার্থিব বস্তু দেখা যায়, প্রত্যেকটির মধ্যেই যেন ঈশ্বর দেখা দেন। একটা ছোট্ট বাড়ী স্বচ্ছ হয়ে উঠল, সেখানে সোনা দিয়ে নকশা করা এবং বিভিন্ন বর্ণময় হলুদ কিমানো পরা এক মহিলা টাটানীর ওপর বসে আছেন। মহিলাটি সুন্দরী এবং বয়স 35 থেকে 40-এর মধ্যে হবে। সোনার সেমিসেন বাজাচ্ছিলেন তিনি। পায়ের কাছে একটি ছোট ছেলে। মহিলার মধ্যে ঈশ্বর মূর্ত হয়ে দেখা দিচ্ছেন যেন।[2]

এই অভিজ্ঞতার সাথে সাথে একদিন বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হল ; মীরা শাক্যমুনিকে ধ্যানে দেখতেন এবং তাঁর সাথে কথাও বলতেন। টোকিওতে রিচার্ডরা ডাঃ ওকাওয়া ও তাঁর স্ত্রীর সাথে একই বাড়ীতে থাকতেন। ডাঃ ওকাওয়া টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। এই দুই পরিবার পরবর্তী জীবনে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন এবং পল ও মীরা ওকাওয়াদের ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের জ্যোতিষ্ক শ্রীঅরবিন্দের কথা বলেন। তাঁরা সবাই ধ্যান অভ্যাস করতেন এবং শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে আলোর দিশা পেতেন ! চল্লিশ বছর পরে ভারতীয় আগন্তুক ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও ডাঃ ভি. কে. গোককেকে এইসব দিনের স্মৃতি মন্থন করে ডাঃ ওকাওয়া বলেন :

---

1. ঐ
2. *Prayers and Meditations*, পৃঃ 251

> চল্লিশ বছর আগে তখনো দেখতাম মীরা দুজ্ঞে´য়বাদিনী ছিলেন... সময়ে সময়ে আনমনা হয়ে পড়তেন, বহু দূরে কিছু দেখছেন এমন ভাব, কখনো আনন্দময় দৃষ্টি।
> একই সাথে মীরা বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্না ছিলেন। এ এক অস্বাভাবিক সংমিশ্রণ...

জুলাই 1917 সালে রিচার্ডরা Akakura Spa-তে গেলেন। সমুদ্র থেকে 2500 ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই মনোরম স্থল চিন্তাশীল লোকদের পক্ষে আদর্শ জায়গা। চারপাশের প্রকৃতি দেখে মীরা গভীর শান্তি পেতেন। কিছুদিন পর তাঁরা জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়টো গেলেন। উদ্দেশ্য, 'স্থির হয়ে বসে থাকা' আন্দোলনের (ভারতীয় যোগের মতো এক পদ্ধতি) প্রবক্তা ডাং ওকাহাটা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডাঃ কোবায়াসী ও শ্রীমতী কোবায়াসীর সাথে সাক্ষাৎ করা। পরে মীরা ও শ্রীমতী কোবায়াসীর মধ্যে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক স্নেহের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিয়টোর বাড়ীর একটি ছোট ঘরে মীরা ধ্যানে বসতেন, মাঝে মাঝে শ্রীমতী কোবায়াসী তাঁর সাথে যোগ দিতেন। জাপানের অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন মিস ডরোথী হজসন, পরে ইনি আশ্রমবাসিনী হন। বহির্বিশ্বে আরো বহু যোগাযোগ গড়ে ওঠে, যেমন টলস্টয়ের পুত্র জাপানে আসেন মানব-ঐক্যের আদর্শ প্রচারে, তিনি রিচার্ডদের সাথে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথের জাপান অবস্থানের সময়ও রিচার্ডরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁর মনে ছাপ ফেলেন ও একসাথে ছবি তোলেন।

'জাপানের নারীদের প্রতি'

এক প্রাণঘাতী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী দিয়ে জাপানে 1919-এর শুরু। মহামারীর ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে মীরা কিছুদিন নিজেকে রক্ষা করলেন। তবু একদিন কৌতূহল হল, এবং তাতেই এই রোগ তাঁর চোখ খুলে দিল :

> ট্রামে করে যাচ্ছিলাম, লোকে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছিল, সর্বত্র এক ভীতির পরিবেশ। আমার মনে এক প্রশ্ন উঁকি দিল, নিজেকে বললাম,

'সত্য সত্যই এই দুর্বলতাটা কীসের ?......বাড়ী এলাম, সেখানে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে ফিরলাম, গায়ে ভয়ানক জ্বর নিয়ে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।[1]

কোনো ওষুধ খেলেন না মীরা, নিজের মধ্যে থেকেই লড়াই চালিয়ে গেলেন :

দ্বিতীয় দিনের শেষে যখন একা শুয়ে আছি, পরিষ্কার একজনকে দেখলাম, ধড় থেকে মাথা কাটা, মিলিটারি পোষাকে একজন......আমার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, অর্ধেক দেহ নিয়ে আমার শক্তি শুষে নিল......আমার জীবনীশক্তির সব সে টেনে নিচ্ছিল...... তখন আমি আমার অলৌকিক শক্তির আশ্রয় নিলাম, দারুণ লড়াই চালিয়ে তাকে পিছু হঠাতে সফল হলাম......এবং আমি জেগে উঠলাম।[2]

শীঘ্রই তিনি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন।

জাপানে থাকাকালে এক মহিলা-গোষ্ঠীর সামনে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পান। 'জাপানের নারীদের কাছে বক্তব্য' পুরুষদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে এক অন্তরঙ্গ অথচ গম্ভীর আলোচনা। মা ও পথ-প্রদর্শিকা হিসাবে নারীর মহতী ভূমিকা রয়েছে, তবে শুধুমাত্র সন্তান-ধারণের জৈবিক নিয়মবলেই সে প্রকৃত মা হতে পারে এমন নয় :

এক নতুন জীবন সৃষ্টি, এক নতুন অবয়ব ব্যবহারে আত্মার যথাযথ বিকাশ সাধনের ইচ্ছার সাথে প্রকৃত মাতৃত্বের শুরু। নারীর আসল ক্ষেত্র আধ্যাত্মিকতায়।[3]

তারপর মীরা খাদ্যাভ্যাস, শৃঙ্খলা ও দৈনন্দিন জীবনাচার সম্বন্ধে বললেন। সুন্দর জীবনযাপন, সৎ ও মহান চিন্তার আদর্শ, উদ্বেগ অস্থিরতা বর্জন করে আদর্শ জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই :

বংশপরম্পরা ও ঐতিহ্যের স্থবির ধারা স্বীকার কর কেন ? স্বকীয় চরিত্রের অবচেতনপ্রবণতা ছাড়া এগুলি কিছু নয়। একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে

---

1. *Questions and Answers* (1953) পৃ: 183
2. ঐ, পৃ: 184
3. *Talk to the Women of Japan* (1967) পৃ: 1

> যখন আমাদের চিন্তার আদর্শ অনুযায়ী ধারা গড়ে তুলতে পারি তখন এগুলি মেনে চলব কেন ? এই প্রয়াসেই মাতৃত্ব মহার্ঘ ও পবিত্র হয়ে ওঠে ; এবং বাস্তবিকই আত্মার গৌরবময় কর্মধারায় আমরা প্রবেশ করি।[1]

তার পরের বক্তব্যে সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর সুর ছিল :

> এই ঘোর অমানিশা আশু প্রভাতেরই লক্ষণ নয় কী ? আগের কোনো রাত্রিই যেমন এত অন্ধকার, ভয়াবহ ছিল না, তেমনি আশু প্রভাতও হয়ত আরো উজ্জ্বল, পবিত্র ও আলোকদ্যুতিময় হয়ে উঠবে......রাত্রির দুঃস্বপ্নের পরে বিশ্ব এক নব চেতনায় জাগ্রত হয়ে উঠবে।
>
> বর্তমানে সভ্যতা যেভাবে নাটকীয়ভাবে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, তার ভিত্তি ছিল মানবিক শক্তি, পার্থিব বস্তু ও জীবন নিয়ে গড়া মন......কিন্তু এক নব সভ্যতার উদয় হচ্ছে, আধ্যাত্মিক সভ্যতা ; মানব-জীবনের পরে আধ্যাত্মিক জীবন।[2]

এই নতুন আধ্যাত্মিক মানুষের উদ্ভবে নারীজাতিকে সচেতনভাবে কাজ করতে হবে। এ-বক্তব্যের দর্শন ছিল অরবিন্দীয়, কেননা শেষের দিকের বক্তব্যে অতি-মানবতার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

পণ্ডিচেরী প্রত্যাবর্তন

মীরার বাইরের জীবন জনহিতকর কর্মে ব্যস্ত থাকলেও সময়ে সময়ে তাৎক্ষণিক রূপ পরিবর্তন ও আনন্দময় আত্মার স্বরূপ দেখতেন, এবং হতাশা, দুঃখ ও যন্ত্রণার মুহূর্তও মাঝে মাঝে দেখা দিত। এই সময়ে পল রিচার্ডের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল এমন হতে পারে। সত্যের অন্বেষক হিসাবেই পল ও মীরার মিলন হয়েছিল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জীবনে জটিলতা ও বিকার আছে। যাই হোক, *Prayers and Meditations*-এর মুখবন্ধ "Oiwake, 3 সেপ্টেম্বর"-এর গুরুত্ব রয়েছে :

---

1. ঐ, pp. 2–3
2. ঐ

যেহেতু এত ভালোবাসা ও যত্নে তৈরি খাদ্য গ্রহণে মানুষ অরাজী, তাই ঈশ্বরকেই আহ্বান করি তা গ্রহণের জন্য ।[1]

যদিও মীরার মতো পলও আধ্যাত্মিকতার অন্বেষক ছিলেন তবুও মীরার আশা মতো পল ততটা হতে পারেন নি হয়ত। অবশ্য তখনকার মতো, তাঁদের সম্পর্কে গভীর কোনো ফাটলও ছিল না :

বারে বারে আমি হতাশার গহ্বর থেকে উঠে এসেছি যা পুনরুজ্জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। অতীতের কিছুই নেই, শুধু অকৃত্রিম ভালোবাসা আমার হৃদয়কে শিশুর মতো নিষ্কলুষ করেছে এবং ঈশ্বরচিন্তার স্বাধীনতা ও প্রফুল্লতা পেয়েছি ।[2]

1920 সালের প্রথমদিকে পল ও মীরা পণ্ডিচেরী ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। মিস হজসন তাঁদের সহযাত্রিণী হন। এই দ্বিতীয় আগমন মীরার কাছে গভীর তাৎপর্যবহনকারী ছিল কারণ তিনি ভালো কিছুর জন্যই আসছিলেন। পণ্ডিচেরী আসার পথে নৌকায় এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয় তাঁর :

সমুদ্রে ভাসমান নৌকায় বসে আছি, কোন ঘটনার অপেক্ষা করছিলাম না (তবে অন্তর্মুখী জীবনে মগ্ন ছিলাম, কিন্তু নৌকায় দৈহিকভাবে অবস্থান করছিলাম)। হঠাৎ পণ্ডিচেরীর দু মাইলের মধ্যে আসতেই পরিবেশের কেমন যেন পরিবর্তন দেখা দিল. আলো বাতাস সবকিছু এত বদলে গেল যে বুঝলাম আমরা শ্রীঅরবিন্দের পরিধির মধ্যে এসে পড়েছি। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ।[3]

তিনি এমন আশাই করেছিলেন, স্বপ্নও দেখতেন এর। শ্রীঅরবিন্দের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই মীরার সাথে তাঁর আত্মিক যোগসূত্র ছিল এবং তাঁরা পরস্পর মিলিত হয়ে যেন একই চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুগত জীবনে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা ছিল প্রায় 5000 মাইল, তা এই চেতনা-মিলনকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। যখন পণ্ডিচেরী ফিরবেন ঠিক হল তখন তিনি উত্তেজনায় অধীর হলেন, কেননা গুরুর পদতলে বসে প্রত্যক্ষ শিক্ষা নিতে পারবেন। তাই পণ্ডিচেরীর

---

1. পৃ: 291
2. *Prayers and Meditations*, পৃ: 291–92
3. *Questions and Answers* (1950–51) পৃ: 199

কাছাকাছি এসে এই অভিজ্ঞতা লাভে গভীর আনন্দিত হলেন, এতদিন ধরে তিনি আন্তরিকভাবে যা কামনা করেছেন তা ঘটতে চলেছে। নিজেই তিনি বলছেন :

> ...সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছিলাম, এর তাৎপর্য এই যে এটা আমি আশা করি নি, একেবারেই না। জানতাম যে, দীর্ঘদিন ধরে শ্রীঅরবিন্দের সাথে আধ্যাত্মিক যোগসূত্র রয়েছে আমার, তাই বলতে পারি, শ্রীঅরবিন্দের পরিবেশের সাথেও এই যোগ ছিল, কিন্তু কোন সময়েই পরিবেশের পরিবর্তনের কথা ভাবি নি, আশাও করি নি এটা হবে। এটাই সমগ্র অভিজ্ঞতাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে, হঠাৎ যেন কেউ অন্য এক তাপমাত্রা ও দ্রাঘিমার অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, এমন ব্যাপার।[1]

1920 সালের 24 এপ্রিল রিচার্ডরা হজসনের সঙ্গে পণ্ডিচেরী পৌঁছলেন। দুটো হোটেল খোঁজার পর একটা বাড়ী ভাড়া করে সেখানে উঠলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেন। মীরা নিজে সবার জন্য রবিবারের খাবার তৈরি করতেন, যে যুবক শ্রীঅরবিন্দের সাথে থাকতেন, তাঁর জন্যও। কথাবার্তা হত সময়ে সময়ে শ্রীঅরবিন্দ অজ্ঞাতেই লিখে বসতেন। এইসময়েই, মনে হয়, পল ও মীরা পরস্পর হতে দূরে সরে যান। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মীরার পরিষ্কার চিন্তা ছিল— পণ্ডিচেরী অবস্থান ও শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক সহায়তায় এক নতুন পৃথিবীর জীবনদান। যদিও পল স্বীকার করতেন যে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ এবং আগামী দিনের নায়ক-নেতা তিনিই, তবু তাঁর কাছে পুরোপুরি আত্মনিবেদন করতে পারেন নি পল। কাজেই মীরা ও শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক চেতনার স্বরূপ বুঝতে না পেরে তিনি দূরে সরে যান। এবং যখন অরবিন্দীয় আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠায় আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়, পল তাতে বিব্রত ও সন্দিগ্ধ হন। শ্রীঅরবিন্দ, মীরা, পল, তিনজনই ক্রমবর্ধমান পার্থক্যের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। পলের সাথে বিচ্ছেদের সম্ভাবনার কথা মীরার অবচেতনে ছিল এবং তাই হয়ত সেইসময় তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ফুটে ওঠে :

> শ্রীমা (মীরা), রিচার্ড আর আমি কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। আমরা দেখলাম, রিচার্ড এমন এক জায়গায় নেমে যাচ্ছেন যার থেকে উঠে আসার সম্ভাবনা

1. ঐ, পৃঃ 205

নেই। তারপর দেখলাম, আমরা একটা গাড়ীতে বসে...তার চালক বারবার গাড়ীটাকে একটা পাহাড়ের ওপর ওঠাচ্ছেন ও নামাচ্ছেন। শেষে একবার উচ্চতম শিখরে উঠে থামলেন। এর তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল।[1]

এটা স্পষ্ট হয় যে পল ও মীরার ব্যক্তিগত জীবনে সংকট এসেছে। 1920 সালের 22 জুন, *Prayers and Meditations*-এ একটা কথা আছে যাতে তাঁর আত্মার ক্রোধ ও মনের জোরের পরিচয় পাই :

হে প্রভু, সবকিছু প্রকাশের বাইরে সেই অনাস্বাদিত আনন্দ দান করে আপনি আমায় দিয়েছেন সংগ্রাম, পরীক্ষা, আমি হাসিমুখে তা বরণ করেছি, এক প্রিয় দূতের কাছে আপনার দান হিসাবে। আগে সংঘাতে ভয় পেতাম, কারণ এতে আমার ভেতরের ঐক্য ও শান্তির প্রতি ভালোবাসা ক্ষুণ্ণ হয়। তবে এখন, হে প্রিয় ঈশ্বর, আনন্দের সাথে একে আমি বরণ করি।[2]

পল এই আশ্রয় থেকে মীরাকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হন, নিজেও প্রভুর শিষ্য হয়ে মনপ্রাণ সঁপে দিতে পারেন নি। তাই শেষে পণ্ডিচেরী ছেড়ে আমেরিকা চলে যান। নিউইয়র্কে প্রাচ্যবিদ্যার একটি ভারতীয় কেন্দ্র স্থাপন করে নিজ পথে ভারত ও এশিয়ার পুনরুজ্জীবনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তবে মীরা ও শ্রীঅরবিন্দকে ছেড়ে তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন এটা ঘটনা এবং 1927-এ দিলীপ কুমার রায়ের সাথে সাক্ষাতে তিনি তা স্বীকার করেছেন :

...শ্রীঅরবিন্দই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই দৃষ্টি (অতিমানবীয় মন) পেয়েছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা অতিমানবীয় মানসিকতায় সমৃদ্ধ এক নবযুগ প্রতিষ্ঠায় তিনিই এই দৃষ্টির প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন...ভবিষ্যৎ পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই হাতে, এবং দুঃখ হচ্ছে যে আত্মস্পৃহার মোহে আমি তাঁর সঙ্গ ছেড়ে এক অর্থহীন জীবন যাপন করছি ; এই একমেব ব্যক্তির সমাজকে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের চেয়ে মহান মনে করি, তাঁকে ছেড়ে আমি এই বিকল্প পথ বেছে নিয়েছি। আমি যদি সবসময়েই আত্মহত্যার কথা ভাবি তবে আপনি কি আশ্চর্য হবেন ?[3]

---

1. নীরোদবরণের *Talks with Sri Aurobindo* (1966) পৃ: 180–81
2. পৃ: 292–93
3. *Among the Great* (1950, Jaico) পৃ: 327

যাই হোক, হতাশার পাঁকে ডুবে পল অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন, এবং নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তিনি অনেক পরে, 1956 সালে জাপানী বন্ধু ডাঃ ওকাওয়াকে নিজের কাজ ও "আধ্যাত্মিকতাশূন্য আমেরিকায় আত্মনির্বাসনের" কথাও লিখেছিলেন।

সাধনা ও সিদ্ধি

ভারতীয় জীবনরীতি রপ্ত করে ও সাধনা করে মীরা ও মিস হজসন পণ্ডিচেরীতে থেকে গেলেন। 1920 সালের 24 নভেম্বর পণ্ডিচেরীতে এক বিধ্বংসী ঝড় হয়, মীরা ও মিস হজসন যে বাড়ীতে থাকতেন তখন তা প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের কথামতো তাঁরা তখন শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীর দোতলায় উঠে আসেন। তারপর থেকেই পণ্ডিচেরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার সূচনা।

মীরা আসার পর প্রথম ক'মাস নানা অসুবিধা ও অযৌক্তিক সন্দেহ দেখা দেয়, তবে শীগ্‌গীরই তা দূর হয়। মীরার স্বভাবজ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব ও দক্ষতা ছিল। গৃহস্থালীতে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। বই সুবিন্যস্তভাবে র‍্যাকে সাজানো হ'ল ও অন্যান্য জিনিসপত্র জায়গা মতো স্থান পেল। সামনের খোলা জায়গাটি শীঘ্রই এক সুন্দর বাগান হয়ে উঠল এবং মীরার শুচিশুভ্র, পবিত্র সুন্দর ব্যক্তিত্ব সমগ্র পরিবেশকে শান্ত, পবিত্র ও গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলল।[1] তখন থেকেই শ্রীঅরবিন্দ, মীরা ও অন্যান্য শিষ্যরা সমবেতভাবে ধ্যান শুরু করলেন।

এই বিরাট পরিবর্তন, নিপুণ ব্যবস্থাপনায় শান্ত পরিবেশ ও সাধনা বাইরের নানা শক্তির উৎপাতে বাধাপ্রাপ্ত হল। যেমন ভাথাল নামে জনৈক রাঁধুনী ভীষণ অবাধ্য ও দায়িত্বহীন ছিল, হজসন তাকে একদিন খুব বকলেন। বরখাস্ত হয়ে সে এক মুসলমান ফকিরের কাছে যায়, ফকিরের কালো জাদুতে উৎক্ষিপ্ত পাথরখণ্ড বাড়ীর মধ্যে আসতে লাগল। মীরা ও শ্রীঅরবিন্দের ধৈর্যচ্যুতি না হওয়া পর্যন্ত বহুদিন ধরে এটা চলল। ধ্যানে বসে মীরা এই দুরাচারীর সন্ধান পেলেন :

1. টি. কোড়ানদারমা রাও, *Breath of Grace*, পৃঃ 42–45

> তিনটে ছোট সজীব বস্তু দেখলাম, এই ছোট্ট পদার্থগুলির কোনো শক্তি ছিল না এবং একটি মাত্র কাজে তাদের চেতনা আবদ্ধ......কিন্তু এই পদার্থগুলি জাদুবিদ্যা পারদর্শী লোকদের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।[1]

মীরা অবিলম্বে এক বোকাসোকা চাকরকে বদলি করলেন, সে অচেতনভাবে ঐ জাদুকর ও বাড়ীর মধ্যে বন্ধনসূত্র ছিল। পাথর ছোঁড়া বন্ধ হল, আবার শান্তি এল এবং ক্ষতিকারক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই বিপরীত-শক্তি বুমেরাং হোল।

ঐ বছরের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'আর্য'-র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে। ভবিষ্যৎ মানুষের সম্বন্ধে নবচেতনা সম্পন্ন একদল চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব হয়েছে এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া জীবনে এক উচ্চতম চেতনার অবরোহণে শ্রীঅরবিন্দ এক নব একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন, এর ওপরই এক গতিশীল আধ্যাত্মিক কেন্দ্র স্থাপনের সাফল্য নির্ভর করবে। 1922, 18 নভেম্বর ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন :

> আমি এখন ও পরে কিছুদিন পর্যন্ত এক যোগাভ্যাসে মগ্ন রয়েছি, জীবন থেকে সরে আসা নয়, মানবজীবনের রূপান্তর সাধনের ভিত্তি হবে এই যোগ...কিন্তু সময় আগত ঐ...যখন এই যোগের আধ্যাত্মিক ভিত্তি থেকে আমি এক বৃহত্তর কাজে হাত দেব।

শ্রীঅরবিন্দের কঠোর সাধনার এই পর্ব ও শ্রীমায়ের দ্বিতীয় আগমনের পর সবার সাথে শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্কের এক পরিবর্তন দেখা দেয়। শ্রীঅরবিন্দ এখন গুরু, যোগের শিক্ষক হিসাবে গণ্য। শ্রীঅরবিন্দ তখনো কিন্তু সবার বন্ধুর মতো, এক সহযোগী ; তবে, নলিনী গুপ্তের কথায়, 'আচার আচরণে শ্রীমায়ের দৃষ্টান্ত দেখেই বোঝা যেত গুরু ও শিষ্যের অর্থ কী...শ্রীমাই আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন।[2]

বাড়ীটি যখন গুরু-পরিচালিত প্রাচীন পর্ণশালার রূপ নিল, মীরা বস্তুজগতের প্রতি ভালোবাসা সম্বন্ধে এক পুষ্প-সঙ্গীত ও পুষ্পের দেবী ও জীব সম্পর্কে এক সঙ্গীত শেখালেন, সব তরুণ শিষ্য তা শিখলেন। শ্রীমা বেড়াল ভালোবাসতেন, আশ্রমে বহু সুন্দর সুন্দর বেড়াল ছিল, 'সুন্দরী' তার একজন। বাচ্চা বেড়ালগুলি মার অনুরাগী

---

1. *Questions and Answers*, মার্চ 10, 1954
2. *Reminiscences*, পৃ: 63–64

ছিল, বিপদে পড়লেই তাঁর কাছে আসত। তিনি তাদের সমস্যা বুঝে সব ঠিক করে দিতেন। মীরার সব কাজেই শিক্ষণীয় কিছু ছিল, এবং তিনি দেখিয়েছিলেন যে বেড়ালদের থেকেও শেখার কিছু আছে।

গৃহস্থালীর পুরো দায়িত্ব এখন মীরার। এই সময়ে তিনি এক প্রকৃত শিষ্যা থেকে শ্রীঅরবিন্দের সক্রিয় সহমর্মী একাগ্র সহযোগী হয়ে উঠলেন। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সন্ধানে আসতেন তাঁদের অনেক সময়ে তিনি বলতেন যে মীরার মাধ্যমেই তিনি সাহায্য করবেন। কানাইলাল নামে এক তরুণ শিষ্যকে মীরা বলেছিলেন :

> তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, প্রত্যাখ্যান করতে হবে ; তবে ভালো হয় যদি তুমি আমাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখ, ভালোবাসো, তখন তোমায় আর কিছু করতে হবে না, আমিই তোমার জন্য সব করব।[1]

সব শিষ্যের সাথে একযোগে মীরা শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনকে (15 আগস্ট) দর্শন-দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করতে শুরু করেন। এই বিশেষ দিন ঈশ্বরের সাথে মুখোমুখি হওয়ার দিন ছিল :

> তিনি বসে আছেন—সাদা ও হলুদ পদ্মমালা পরে। ছোট ফুলটি শিষ্যরা নিবেদন-স্মারক হিসাবে দিয়েছেন। হৃদয় উদ্বেলিত, অনুরোধ—আবেগ ঝরে পড়ছে—এবং আশীর্বাদের বন্যা সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল...সেই দৃষ্টি! বিমোহণকারী, আকর্ষণীয় সে-দৃষ্টি কে ভুলতে পারে ?...কোনো অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা এতে না থাকলে আর কোথায় আছে ?[2]

এইসব ক্ষেত্রে মীরা শ্রীঅরবিন্দের পাশে ছোট টুলে বসতেন, কয়েক মিনিট নীরবতার পর শ্রীঅরবিন্দ ছোট ভাষণ দিতেন।

1925 সালে মীরা হাঁটুর স্ফীতিরোগে ভোগেন। পনের দিন উদ্বেগের সাথে কাটানোর পর তা সেরে যায়। সেই বছর ফিলিপ বারবিয়ে সেন্ট হিলেইরে নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক এ্যাসপিরান্ট গোষ্ঠীতে যোগ দেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নতুন নামকরণ করেন পবিত্র এবং শ্রীমাকে তাঁর সাধনার বিষয় দেখতে বলেন। তারপর থেকে আশ্রমের সাধকরা তাঁর রক্ষণাধীনে এলেই তিনি তাঁদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক

---

1. *Breath of Grace*, পৃ: 40
2. *Evening Talks, II*, পৃ: 303

প্রয়োজনের দিকে নজর দিতেন। সাধকরা অনুভব করেছিলেন যে তাঁদের সাধনার পূর্ণ বিকাশে উভয়ের (শ্রীঅরবিন্দ ও মীরা) প্রভাব প্রয়োজন। বুদ্ধিগত উৎকর্ষতায় পরিণত হলে তবে শ্রীঅরবিন্দের উচ্চমার্গের যোগ বোঝা যায়, মীরার সরাসরি মানসিক যোগসূত্র স্থাপনের পদ্ধতি নতুনদেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভি. চিদানন্দম নামে এক শিষ্য মীরার ওপর এক কবিতা রচনা করেন, তাঁর চোখে মীরা বিয়েত্রিসের মতো সৌন্দর্য ও শিক্ষা নিয়ে এসেছেন :

আমি তোমার রহস্যের রূপ দেখেছি
সৌন্দর্যে রূপ নিতে,
ঈশ্বরের মহত্ত্ব নিয়ে......
বহুদূর হতে কোনো এক দেবদূত আবির্ভূত হলেন এখানে
পৃথিবীকে আলোকময় করতে, নিষ্প্রভ আকাঙ্ক্ষার পৃথিবীকে আলো দিতে।[1]

এরপর 1926 ছিল শূন্য ও অনুপযোগী তাৎপর্যে ভরা। প্রার্থনা, ধ্যান ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মাধ্যমে শিষ্যদের পথ নির্দেশ করার পুরো ভার মীরা নিজের কাঁধে নিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই শিষ্যরা তখন তাঁকে মীরা দেবী রূপে না দেখে মা হিসাবে দেখতে লাগলেন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে 'মা' সম্বোধন করে সবাইকে পথ দেখালেন এবং তাঁকে আশ্রমের জীবন্ত প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কী ঘটতে চলেছে তা যেন তিনি সবই জানতেন।

24 নভেম্বর, 1926 সালের মহান দিনটি এল। নিয়মমতো শ্রীঅরবিন্দ ও মীরা সাধকদের সাথে ধ্যানে বসেছেন। সাধকরা অনুভব করলেন, পরিবেশে যেন অদ্ভুত শক্তিশালী কিছু হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ ও মীরা যখন সব সাধককে আশীর্বাদ করলেন, তাঁরা স্পর্শে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি বোধ করলেন। উভয়েই চলে যাবার পর সাধকরা বুঝলেন যে শ্রীঅরবিন্দ এক নতুন সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং মীরা তাঁদের সবার মা। সেদিন থেকে শ্রীঅরবিন্দ একেবারে পৃথক নির্জনে থাকতে লাগলেন, শুধুমাত্র দর্শন-এর দিনে দেখা দিতেন। আশ্রমের মা হিসাবে মীরা ক্রমবর্ধমান আশ্রমবাসীদের দায়িত্ব নিলেন। শ্রীঅরবিন্দ শান্তিতে সাধনা করতে থাকলেন এবং অলৌকিক সত্তাকে অবরোহণ করিয়ে জগৎ আলোকময় করে তুললেন। তবু শ্রীমা ও অন্যান্য শিষ্যের মাধ্যমে তিনি আশ্রমবাসীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, সাধকদের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সমস্যাবলী নিয়ে পত্রালাপে যোগাযোগ করতেন।

1. *Mother India*, ফেব্রুয়ারী 1969, পৃ: 23

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎসর্গ

ঋষির দৃষ্টি নিয়ে তিনি আসছেন।
তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন মানুষকে,
চরৈবেতির ডাক দিয়ে
তার পথকে করছেন সুগম।
কী বিশাল এক মহান দিব্য রথে তিনি বসে আছেন ;
অন্তর্যামী হয়ে তিনি সর্বত্র বিরাজিত—
দিনকে আবাহন করে
প্রজ্জ্বলিত আলোক হাতে তিনি এগিয়ে আসছেন।

ঋগ্বেদ
(শ্রীঅরবিন্দ কৃত ইংরাজী থেকে অনূদিত)

আশ্রম

এখন শুধু আত্মনিবেদনের পালা, শ্রীঅরবিন্দের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজ করে যাওয়া। আশ্রম-জীবন সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য ক্রমবর্ধমান শিষ্যদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা উঠল। যে-দুটি ভাড়া বাড়ীতে তাঁরা থাকতেন তাদের নাম হল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। তিনদিন ধ্যানে চিন্তা করার পর শ্রীঅরবিন্দ নিজেই এই নাম পছন্দ করেন, কারণ তাঁর মতে আশ্রম হচ্ছে "শিক্ষকের আবাস যেখানে ছাত্র ও শিষ্যরা তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পাবার জন্য, ঈশ্বরের দর্শন লাভের পথ সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য সমবেত হন।"[1]

শ্রীমার কাছেও এই ঘটনা বহুদিনকার স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন। তরুণ যুবা বয়স থেকেই তিনি এক বিশেষ জগতের কথা ভেবেছেন যেখানে আধ্যাত্মিক জীবনের পথিকরা জাগতিক বিষয় ভুলে সাধনা করবেন। সেইমতো তিনি প্রচণ্ড উদ্দীপনা ও আস্থার সাথে এই কাজের দায়িত্ব নেন এবং বাস্তব বুদ্ধি ও মনের স্থৈর্য থাকার গুণে তিনিই শ্রীঅরবিন্দের 'দেব সঙ্ঘ' রূপায়ণের পক্ষে যোগ্য ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নীরোদবরণকে বলেন :

> আমার সব বোধি—নির্বাণ ও অন্যান্য, সবই হয়ত পার্থিব জগতে তত্ত্বের স্তরেই থেকে যেত। শ্রীমাই একে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথ দেখান। তাঁকে ছাড়া কোন সংগঠিত অভিব্যক্তি সম্ভব ছিল না।[2]

এটা মনে রাখা দরকার যে দুই পরিবর্তনই—শ্রীঅরবিন্দের সরে থাকা ও মার নেতৃত্বে প্রথমে বেশ ভ্রূকুটি দেখা গিয়েছিল, বেশ কিছু অভিযোগ ও দোষারোপের ঘটনাও হয়েছিল। লোকে এতদিন জানত যে শ্রীঅরবিন্দ হচ্ছেন গুরু, এবং মীরা তাঁর প্রধান শিষ্যা। তাঁকে মা হিসাবে মেনে নেওয়া অনেকের কাছেই বেশ শক্ত ছিল। শ্রীঅরবিন্দ সাধকদের কাছে এই ভুল চিন্তাধারা ধরিয়ে দেন এবং তাঁদের সঠিক পথ দেখান। বারংবার তিনি বলেছেন যে তাঁর চেতনা ও মার চেতনা একাত্ম ; এবং

---

1. দ্রষ্টব্য : এম. পি. পণ্ডিত, *Service Letter* 16, পৃঃ 6–7

2. *Talks with Sri Aurobindo* (1966), পৃঃ 6

এক ভগবদ্‌চেতনা তাঁদের চেতনায় বিরাজমান। অন্য সমস্যাও ছিল। কেউ কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে অদ্ভুত সব আচরণ করছিলেন। অনেকে আবার নতুন আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাবল্য সহ্য করতে পারছিলেন না। সে সময়েই, 1926-এর 24 নভেম্বরের পর থেকে তিন মাস ছিল উজ্জ্বল অধ্যায়, যখন সব নিঃশ্বাসেই আলো ছিল, প্রবহমান বাতাসেও ছিল আধ্যাত্মিক গৌরবের মেঘ। মার নিজেরও মহান সব অভিজ্ঞতা হচ্ছিল এবং তিনি দেখলেন, ইচ্ছা করলে তিনি দুর্জ্ঞেয় অলৌকিক ক্ষমতার ভিত্তিতে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে এই পথ থেকে বিরত করলেন।

> হ্যাঁ, এটা এক অতিমানসীয় সৃষ্টি...অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা ঘটিয়ে আপনি পৃথিবীখ্যাত হতে পারেন...এ এক বিরাট সাফল্য হবে...এবং এই সাফল্য আমরা চাই না, আমরা অতিমানসীয় সত্তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে, অতিমানবিক জগৎ সামগ্রিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই তাৎক্ষণিক সাফল্যের আশা ত্যাগ করতে জানতে হবে।

শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের যুক্তি বুঝলেন, কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন এবং মানুষের জন্য দুর্জ্ঞেয় স্বর্গরচনার ইচ্ছা হতে নিবৃত্ত হলেন। তারপর থেকেই আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশিত পথে অতিমানসীয় সত্তাকে পার্থিব জগতে অবরোহণ করার পথে শান্তভাবে সাধনা এগোতে থাকল। শ্রীমাকে যাঁরা আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে মেনে নিতে পারলেন না, নিজ থেকেই তাঁরা পণ্ডিচেরী ছেড়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্র অন্যতম। তবুও এঁরা দক্ষ সংগঠন ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার জন্য শ্রীমাকে সম্মান করতেন। প্রায় 15 বছর পর বারীন্দ্র 'খুলনা বাসী' (21 ফেব্রুয়ারী, 1940) পত্রিকায় লেখেন :

> আজ শ্রীমার জন্মদিন। এই পুণ্য দিবসে লক্ষ্যভ্রষ্ট পুত্র তাঁর পদতলে এই সম্মানার্ঘ্য নিবেদন করছে। ভুল পথে যতই বিপথগামী হই, আমার যত ভুলই হয়ে থাক, আমার গোলকধাঁধাঁসম কর্মধারা শেষে মার চেতনা-মন্দিরের দিকেই নিয়ে যাবে, কারণ যাত্রাশেষে ছেলে মায়ের কোল ছাড়া কোথায় স্থান পাবে ?[1]

---

1. উদ্ধৃত : নারায়ণ প্রসাদ, *Life in Sri Aurobindo Ashram*, ২য় সংস্করণ, (1968), পৃঃ 235

শ্রীমা

আশ্রমের ভেতরের লোক যাঁরা, তাঁরাও প্রায়ই নানা অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। অবশ্য প্রতি বছর আশ্রমবাসীর সংখ্যা বাড়ার জন্য এধরণের ভুল-বোঝাবুঝি দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। বহু অভিযোগপত্র আসত, শ্রীঅরবিন্দ সবসময়েই ধৈর্য ধরতেন এবং আধ্যাত্মিক মাতৃত্বের ধারণা সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করতেন। মার বকুনি খাওয়ার ভয়ে অনেক সময়ে সাধকরা ভয়ে ভয়ে থাকতেন। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় :

> মা, সকালেই আপনার ভ্রূকুটি ও অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দেখে সব উৎসাহ নিভে গেল। আমায় ভালভাবে জেনেও ঈশ্বর আমায় এমন পরীক্ষার দিকে ঠেলে দিলেন—তারপর আপনারও সন্তুষ্ট না হওয়ার সেই দৃষ্টি !

শ্রীঅরবিন্দ মার হয়ে উত্তর দিয়ে দিলেন :

এটা শুধুই কল্পনা, এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। ভৎ´সনার প্রশ্নই ছিল না...আবার সন্তুষ্ট না হওয়ার দৃষ্টিও কল্পনা ! আমি আবার বলছি, তিরস্কারের কোনো ব্যাপার ছিল না।[1]

এভাবেই কখনো গম্ভীর কখনো ঠাট্টার সুরে শ্রীঅরবিন্দ সাধকদের সন্দেহ ও হতাশার সমুদ্র অতিক্রমের উপায় এবং সিদ্ধির পথ দেখাতেন। সাধক মনোনয়নে শ্রীমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এবং কাকে কোন্ কাজে দিলে তার আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়ক হবে তা ঠিক করতেন। উচ্চমার্গ থেকে তিনি কাজ করতেন, এবং সেজন্যই তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ঈশ্বরের কৃপাধন্য মুকুল অঙ্কুরিত হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল। যেমন একবার মা বলেছিলেন :

> 1926 থেকেই, যখন শ্রীঅরবিন্দ অবসর গ্রহণ করেন ও আমায় পুরো দায়িত্ব দেন (সে সময়ে মাত্র দুটো ভাড়া বাড়ী ও কিছু শিষ্য ছিলেন), তখন অরণ্যের বৃক্ষরাজির মতোই সব কিছু বেড়ে উঠেছে ও বিকশিত হয়েছে এবং সব উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কোনো কৃত্রিম পরিকল্পনা দিয়ে নয়, এক

1. শ্রীনীরোদবরণ, *Sri Aurobindo's Humour* (1974), পৃঃ 2

> জীবন্ত গতিশীল প্রয়োজনেই তা করা হয়েছিল। নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি ও বিকাশের পেছনে এটাই কাজ করেছিল।[1]

ইহজগৎকে অস্বীকার করে নয়, এর ক্রমবিবর্তনের ধারায় সহযোগী হয়ে চলতে হবে। কোনো কিছু লাভের উদ্দেশ্যে কাজ নয়, কোনো বেতন নয়, ঘুমন্ত ও জেগে-থাকা অবস্থায় সর্বসময়ে ঈশ্বরের প্রার্থনায় নিয়োজিত হতে হবে। 'সবসময়ে মনে রাখবে, তুমি মায়ের কাজ করছ,' শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, 'এবং তাঁকে মনে রেখে যদি এই কাজ ভালোভাবে করতে পার, তবে মার করুণা লাভ করবে।'[2]

এক আশ্রমবাসীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ মার কার্যবিবরণী দিতে গিয়ে চারটি রূপের কথা বলেন : মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহেশ্বরী। শ্রীঅরবিন্দের উত্তরের এই অংশ The Mother আধ্যাত্মিক বিষয়ের ক্লাসিক হিসাবে গণ্য। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিতপ্রাণ হলে তবেই মানবতার অক্ষয় আকাঙ্ক্ষার প্রার্থনায় ঈশ্বর করুণা বর্ষণ করবেন বলে শ্রীঅরবিন্দ ভরসা দেন :

> বিশ্বাস, সততা ও আত্মনিবেদন যত সম্পূর্ণ হবে ততই তোমার ওপর করুণা ও ভরসা থাকবে। এবং মার কৃপা ও ভরসা পেলে তোমায় কী স্পর্শ করতে পারে, তোমার ভয়ই বা কী ? এর কিছুমাত্র পেলেই সব বিপদ, বাধা ও সমস্যা অতিক্রম করতে পারবে ; এর সবটা পেলে তুমি নিজ পথে নিশ্চিত মনে এগিয়ে যেতে পার, কেননা তা সব ভয়মুক্ত এবং সব ধরণের শত্রুতার কবল-মুক্ত, তা এই পৃথিবী বা বাইরের অদৃশ্য জগৎ, যেখান হতেই আসুক না কেন। এর স্পর্শেই সব বাধা সুযোগে পর্যবসিত হতে পারে, ব্যর্থতা সাফল্যে এবং দুর্বলতা অবিচলিত শক্তিতে পরিণত হতে পারে। কারণ পবিত্র মার কৃপাই ভগবানের আজ্ঞা, আজ হোক কাল হোক এর প্রভাব পড়বেই, এ এমন-এক বস্তু যা চূড়ান্ত, অপরিহার্য ও অপ্রতিরোধ্য।[3]

অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বচরাচরের ওপরে স্থিত মূল অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বললেন, সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে সর্বময় ঈশ্বরের রহস্যময় বিকাশের সাথে যুক্ত করলেন। জাগতিক বিশ্বজনীন শক্তি হিসাবে "তিনি সব

---

1. *Bulletin*, আগস্ট 1964, পৃ: 96
2. Centenary Edition, সংখ্যা 25, পৃ: 213
3. *The Mother* (1971, পুনর্মুদ্রণ), পৃ: 10–11

জীবের স্রষ্টা ; ধারক বাহক, এই লক্ষ লক্ষ প্রক্রিয়া ও শক্তিসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন।"[1] তাছাড়া ব্যক্তিগত আকারে মহাশক্তি তাঁর সত্তায় বিরাজমান, যে-মানবরূপী অবতার এই দুই বিশাল অস্তিত্ব ও রূপ ধারণ করেন, তাদের বাঁচিয়ে আমাদের কাছে রাখেন এবং ভগবদ্প্রকৃতি ও মানবীয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন। আশ্রমের মাকে এই সত্তার ব্যক্তিক প্রকাশ বলে গণ্য করতে হবে :

> ঈশ্বর মানবিক রূপ গ্রহণ করেন, পথ চলার জন্য মানুষের বাইরের চরিত্র নিয়ে মানুষকে তা দেখাতে চান, কিন্তু ঐশ্বরীয় প্রকৃতি থেকে নিবৃত্ত হন না। এ-ও এক বিশেষ অভিব্যক্তি, ক্রমবর্ধমান ঐশ্বরীয় চেতনার বিকাশ, এটা মানুষের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি নয়। ছেলেবেলায়ও শ্রীমা ভেতরে ভেতরে মানব-প্রকৃতির চেয়ে উচ্চমার্গে ছিলেন।[2]

পৃথিবীতে মার কাজের বিশদ পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ গীতার বিভূতি যোগ-এর অবিস্মরণীয় সেই বিবরণ মনে করিয়ে দিচ্ছেন :

> শ্রীমা ওপর থেকে সব নিয়ন্ত্রণই করেন না, এই তেহারা বিশ্বে অবরোহণ করেন। নৈর্ব্যক্তিক স্তরে সবকিছু, এমনকি অচেতন বস্তুর চলাফেরার মধ্যেও তাঁর প্রচ্ছন্ন শক্তি কাজ করছে—মহান আত্মদানে তিনি স্বীকৃত হয়েছেন এবং অচেতনের আত্মা ও শরীরে আবরণের মতো রয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি প্রসন্নচিত্তে এই অন্ধকারের মধ্যে অবরোহণ করেছেন যাতে একে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, মিথ্যাচার ও ভ্রমাচারের মধ্যেও অবরোহণ করেছেন যাতে একে সত্যে পরিণত করতে পারেন, মৃত্যুর মধ্যে এসেছেন তাকে ঐশ্বরিক জীবনদানের জন্য, ইহজগতের দুঃখের মধ্যে এসেছেন তাকে তাঁর মহান ঐশ্বরীয় আনন্দে রূপ দানের জন্য। এই মহান আত্মত্যাগকেই পুরুষ-এর আত্মত্যাগ বলা হয়, কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে এ এক প্রকৃতির যজ্ঞ, ঈশ্বরময়ী মার আত্মত্যাগ।[3]

সাধকদের আর কোনো সন্দেহ রইল না, তাঁদের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিবেদনের

---

1. ঐ. পৃঃ 23
2. Centenary Edition, সংখ্যা 25, পৃঃ 48
3. *The Mother*, পৃঃ 29–30

ভাব এল। আশ্রমের বাইরের বহু ব্যক্তিও শ্রীমার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। কাব্যগন্থ গণপতি মুনি নামে অন্ধ্রের এক সন্ন্যাসী-কবি 1928-এর আগস্টে মার সাথে দুবার দেখা করেন ও তাঁর সাথে ধ্যান করেন। তিনি মার মধ্যে শক্তির এক উন্নত রূপ শাকম্ভরীর প্রকাশ দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন যে "তাঁর গোড়ালী থেকে উজ্জ্বল আলো, তাঁর চারধারে এক আলোকরশ্মির বিকীরণ হচ্ছে, এবং তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে বিচ্ছুরিত আলোকছটা শাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে। এই প্রথম সারা ঘর বিদ্যুৎময় হয়ে উঠল।"[1]

বহু বিদেশীও মার আশ্রয়ে এসে থাকতেন। মিস হজসন ও সেন্ট হিলেইরে (এখন দত্তা ও পবিত্র নামে পরিচিত) ছাড়াও ছিলেন জে. এ. চাডউয়িক নামে কেমব্রিজের গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক, তাঁর আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া হল আর্যভ, মারগারেট উইলসন (প্রেসিডেন্ট উইলসনের মেয়ে) যাঁর নাম দেওয়া হল নিষ্ঠা। ভারতীয়-বিদেশী যিনিই হোন, প্রথম দর্শনেই তাঁরা শ্রীমার আপন লোক হয়ে যেতেন। এক ভারতীয় ব্যবসায়ী দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে এসে পণ্ডিচেরী আসেন এবং আশ্রম দেখতে চান :

> যখন বাড়ীটাতে ঢুকলাম, দেখলাম বহুলোক, সবাই পরিষ্কার অথচ সাদাসিধা পোষাক পরা, অনেকে কোট প্যান্ট পরে আছেন, কিন্তু কোনো সাধুসন্ত ও সন্ন্যাসী অথবা গেরুয়াধারী সাধু, তিলকধারী, জটাধারী, বা কানফাটা সাধু চোখে পড়ল না। কোনো মন্দির, মূর্তি, ধর্মগ্রন্থও দেখলাম না।[2]

তারপর শুনলেন যে বছরে মাত্র চারদিন আশ্রমের গুরু দর্শন দেন, তাও কয়েক মুহূর্তের জন্য। আশ্রমের মা এক ফরাসী মহিলা আছেন। শ্রীমার সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁকে ধ্যান করার হলঘরে অপেক্ষা করতে বলা হল। এ আবার কীরকমের আশ্রম, তিনি ভাবলেন : 'কোনো কথকতা বা কীর্তন শোনা যাচ্ছে না, কোনো শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না, প্রার্থনা-ভজনার ব্যাপার নেই, আরতি বা ভজন গান হচ্ছে না, কোনো আলোচনাও নেই, যাগযজ্ঞ আসন প্রাণায়াম নেই, মন্ত্রোচ্চারণ বা সভাও নয়!' এ তো বেশ বিভ্রান্তির ব্যাপার! তারপরই শ্রীমা এলেন :

> তাঁর ভঙ্গীতেই রাজকীয় মহিমা, চোখে মুখে কমনীয়তা, দৃষ্টির দিব্যজ্যোতিতে চারপাশের অন্ধকার চূর্ণবিচূর্ণ। আমার চোখ তাঁর সম্মোহনী চেহারায়

1. *Breath of Grace*, পৃঃ 363–64
2. সুরেন্দ্র নাথ জোহর, *My Fateful Journey* (1973), পৃঃ 5–6

> নিবদ্ধ, শান্ত, সুন্দর মুখ থেকে যেন আলো বেরুচ্ছে এবং চতুর্দিকের পরিবেশ এমন অতিপ্রাকৃত হয়ে উঠল যাতে মনে হল স্বর্গ থেকে কোন দেবদূত নেমে এসেছেন......
> সে রাতে ঘুমবার সময়ে অদ্ভুত, মিষ্টি সব অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। মনের মধ্য দিয়ে স্বপ্নমঞ্জরী বয়ে গেল। সৌন্দর্য ও কমনীয়তা, প্রেম ও জীবনের মূর্ত প্রতীক সেই রাজকীয় ব্যক্তিত্ব গতিময় চলচ্চিত্রের মতো আমার মনের চিত্রপটে আঁকা হয়ে গেল।[1]

এইভাবেই সুরেন্দ্রনাথ জোহরের সর্বোত্তম আবিষ্কার, "পণ্ডিচেরীর অলৌকিকত্ব, যেখানে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম, আত্মা ও প্রকৃত সত্তার রূপ খুঁজে পেলাম।" তিনি সপরিবারে আশ্রমবাসী হলেন। তাঁর মতো বহু লোক মার হাসি, কথা বা আশ্বাসবাণী শুনে অথবা স্বাগতমের ভঙ্গি দেখে আনন্দে মোহিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু মা সবসময়ে দেখতেন যাতে সবাই স্বইচ্ছায় আশ্রমে আসেন। সেজন্য 23 বছর বয়সী কে. ডি. শেঠনা যখন বলেন যে জীবনের সবকিছু তিনি দেখেছেন এবং এখন আশ্রমবাসী হতে চান, শ্রীমা তাঁকে বলেন :

> ওঃ, 23 বছরেই তুমি জীবন দেখে নিয়েছ ? এত তড়িঘড়ি নয়, ধীরে, বৎস। এখানে থাক, চারদিক দেখ, কীভাবে কী আছে দেখ, এর সাথে তুমি মানিয়ে চলতে পারবে কিনা দেখ, তারপর সিদ্ধান্ত নাও।

যাই হোক, মার ব্যক্তিত্ব অপ্রতিরোধ্য ছিল। শেঠনা যখন মার চোখের শুভ্র আভা দেখলেন, 14 বছর বয়স্ক বসুধা মায়ের মিষ্টি হাসিতে বিমোহিত হয়ে পড়লেন, এবং চিরতরে আশ্রমে থেকে গেলেন। মা জানতেন যে ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে সাধকদের কীভাবে আকাঙ্ক্ষিত রূপান্তর সাধন করা যায়। সৎনিষ্ঠা, ঐক্যভাব, মুক্ত মন ও প্রেমের ওপর সবসময়েই তিনি জোর দিতেন এবং ছেলেমেয়েদের সব সাহায্যের আশ্বাস দিতেন। যেমন এক তরুণ সাধককে বলেছিলেন :

> পবিত্র অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয় ও সমগ্র সত্তাকে ঘিরে রাখে ; অগ্নি সবকিছুকে আলোকিত ও নিষ্কলুষ করে। প্রতিবারই যখন তুমি আমায়

1. ঐ, পৃঃ 7–8

অগ্রগতির কথা জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার মধ্যেকার এই আগুন জ্বালিয়ে দিই, কিন্তু অগ্নি মিথ্যা ও অস্বচ্ছতা ছাড়া কিছুকেই ধ্বংস করে না......[1]

দৈহিক স্তরে তিনি ছিলেন আদর্শ মাতার মূর্ত প্রতীক :

তোমার চাহিদা সম্বন্ধে সরাসরি জিজ্ঞাসা করি...তুমি তোমার মার কাছ থেকে সবসময়েই গ্রহণ করতে পার, এটাই স্বাভাবিক বিশেষ করে যখন মনপ্রাণ দিয়ে কিছু দেওয়া হয়...আমি তোমার মা নই যে তোমায় ভালোবাসে ?[2]

আশ্রমের ক্রমবর্ধিষ্ণু অবস্থা (1942-এ আশ্রমবাসী 350 জন, তাছাড়া অনুমোদিত দর্শক ছিল) এবং দর্শন দিবসে জনতার ভীড়, এসবে আশ্রমের কাজে মার দায়িত্ব বাড়ে। অর্থের সমস্যাও ছিল। ঘাটতি থাকতই, যত টাকাই আসুক তা যথেষ্ট ছিল না। নিজের ব্যাপারে মা অনেক কিছু ত্যাগ করলেন এবং বাস্তববোধ দিয়ে প্রধান হিসাবে আশ্রমকে স্বনির্ভর করে তোলায় নিয়োজিত হলেন।

পরের বছর সিদ্ধি দিবস-এ (24 নভেম্বর 1926) মার দিনের কাজ শুরু হল প্রত্যূষের অনেক আগে। সামনের চত্বরে প্রাতঃভ্রমণ করতেন ছটায়, তারপর সাধকদের সাথে সাক্ষাৎ ও ধ্যানের অধিবেশন :

শাড়ী পরিহিতা মা পা মুড়ে বসবেন, অদ্ভুত সুন্দর এক আভা তাঁকে ঘিরে। এক মহান শান্তির প্রতিচ্ছবি যেন। তবে তাঁর মধ্যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে, যেন শত সহস্র বছরের ভ্রমণের পর এবং সবকিছু দেখে নেবার পর ফিরে এসে বসেছেন। সব যাত্রাই তাঁর কাছে এসে যেন থেমে যায় এবং আমরা যখন তাঁর পায়ের কাছে বসলাম, আমাদেরও সব যাত্রার ঐখানেই শেষ। আমাদের সব সমস্যা অন্তর্হিত হল।[3]

মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ে তিনি খাদ্যবন্টন দেখাশোনা করতেন। বিকেলে হয়ত সাধকদের ঘরে যাবেন, সন্ধ্যায় শিষ্যদের নিয়ে বেড়িয়ে আসবেন। কোনো নিভৃত স্থানে বসে মিষ্টি খেতে খেতে তাঁরা মার কথা শুনবেন, বা ধ্যান করবেন।

1. *Breath of Grace*, পৃ: 333
2. ঐ, পৃ: 183
3. *Light and Laughter*, পৃ: 46-47

কয়েকমাস ধরে জাপানের চা-পানোৎসবের অনুকরণে সূপ-পানের উৎসব উদ্‌যাপিত হল। সাধকরা সন্ধ্যায় একটি ঘরে সমবেত হয়ে মাদুরের ওপর বসতেন। সূপের পাত্রটির ওপর হাত রেখে মা ধ্যান করতেন, তারপর অনেক কাপে সেই সূপ ভাগ করে সাধকদের এক এক করে দিতেন। মার কোন কথায় অথবা সম্মোহনকারী হাসিতে নীরবতা ভাঙত। এই উৎসবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক মিলন এবং শেঠনার কথায় :

> প্রতি সন্ধ্যায় এটা এক গুরুত্বপূর্ণ আচার ছিল। প্রাচীন কালের রহস্যের মতো এটা আমায় প্রভাবিত করত। পরিবেশটা ছিল অনেকটা পুরনো গ্রীক যুগের বা মিশরের গুপ্ত মন্দিরের মতো।[1]

কথোপকথন

1928-29 সালের প্রথমে ম্যাকফিটারসের বাসভূমিতে, পরে দিলীপ কুমার রায়ের বাড়ীতে শ্রীমা সাপ্তাহিক প্রশ্নোত্তরের অধিবেশনে যোগ দিতেন। মার কাছে প্রথমে প্রশ্ন করা হোত, তিনি তার উত্তর দিতেন। নলিনী গুপ্ত বা ভায়লেট ম্যাকফিটারস আবার সেগুলি লিপিবদ্ধ করতেন। *Words of the Mother* নামক গ্রন্থ হিসাবে এখন তা প্রকাশিত হয়েছে। এইসব কথোপকথনে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বিধৃত এবং তা অরবিন্দীয় যোগের এক আকর্ষণীয় দিক স্বরূপ :

> ভগবদ্‌চেতনায় ব্যক্তিসত্তা বিলীনের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ছিল ভগবদচেতনা যাতে পদার্থে ঢুকে তার রূপান্তর সাধন করে।[2]
> ঈশ্বরের করুণায় আস্থা রাখা যায় কিভাবে তা আমাদের শিখতে হবে এবং সব পরিস্থিতিতে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে ; তখনই তা ক্রমান্বয়ে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারবে।[3]

---

1. ঐ, পৃঃ 63
2. *Words of the Mother*, (1946), পৃঃ 32
3. ঐ, পৃঃ 215

যেসব বাধা পেয়ে আমরা ভুল পথ নিতে প্রলুব্ধ হই, সে সম্বন্ধে মা বলছেন :

> ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন জিনিস এলে তোমরা সহজেই তা বুঝতে পারবে। তোমরা মুক্ত, আশ্বস্ত বোধ করবে, তোমাদের মনে শান্তি বিরাজ করবে... তাঁর সাথে একাত্ম হবার পক্ষে একমাত্র শর্ত হচ্ছে মনের সম ভাব।[1]

কেউ যাতে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিতে গভীরভাবে আবদ্ধ না হয়ে পড়েন, সে সম্বন্ধেও মা সাবধান করে দিতেন, কারণ তাতে যান্ত্রিক তত্ত্বের অধীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে :

> সব ধর্মেরই একই কাহিনী। বিশ্বে এক মহান শিক্ষকের আবির্ভাবের সূত্রেই বিশেষ ধর্মের উৎপত্তি। তিনি আবির্ভূত হন এবং ঈশ্বরের মূর্ত প্রতিভূ হয়ে তাঁর বাণী প্রচার করেন। কিন্তু লোকে তাঁকে অবলম্বন করে, ব্যবসা করে এবং এর ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে প্রায়।[2]

ঐশ্বরীয় জীবনাদর্শের অবিচ্ছিন্ন বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি, এবং তাঁর কথোপকথনেও উচ্চমার্গের ও পবিত্র জীবনধারণের কথা বলা হত। এ সম্পর্কে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলছেন :

> উপরে উপরে খুব সাদাসিধে কথাবার্তা মনে হলেও এর মধ্যে নিহিত গভীর চিন্তা ও আন্তরিকতার সুরের জন্য অরবিন্দীয় যোগসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। নিজের নানা অভিজ্ঞতা এবং দুর্জ্ঞেয় জগতের অভিজ্ঞতা থেকেই মা এসব কথা বলতেন, কিন্তু উপরের সমর্থনের জোরেই এই কথোপকথন প্রামাণিক ও কর্তৃত্বময় হয়ে উঠেছিল, কারণ এটা পরিষ্কার ছিল যে তিনি উচ্চমার্গের প্রত্যক্ষ ধারণা থেকেই কথা বলতেন। জীবন, শিল্প ও যোগ, নৈতিকতা, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা, মুক্ত ইচ্ছা, ভাগ্য ও করুণা, সবকিছুকে একই সামগ্রিক আধারে রেখে পরস্পর সম্পর্কিত করে তিনি ব্যাখ্যা করতেন। এবং সেই মহাবাক্য—চেতনাসম্পন্ন হও! মনে রাখ এবং নিবেদন কর! ভগবদসত্তায় নিমগ্ন হও! উচ্চশির ল্যাম্পপোস্টের মতো হয়ে সর্বত্র আলোকিত কর—সব পথে—ভবিষ্যতের জন্য।[3]

---

1. ঐ, পৃ: 50
2. *Words of the Mother*, পৃ: 150
3. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের প্রকাশিতব্য বই, *On the Mother*

তবে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে আশ্রমের জীবন সবসময়েই গভীর আলোচনা, ধ্যান ও নিবেদিত কর্মযজ্ঞে পূর্ণ ছিল। হাল্কা মেজাজের মুহূর্তও ছিল, কোন কোন সন্ধ্যায় মা এক ঘন্টা দু ঘন্টা তাস খেলে কাটাতেন—অথবা মাথায় লেবু রাখার খেলায় শিষ্যদের সাথে যোগ দিতেন। এই মুহূর্তগুলি ছিল নির্মল হাসিঠাট্টা ও রসিকতায় ভরা। খেলার মধ্যেও মা পুষ্প-প্রেম আমদানী করেছিলেন। সব ফুলের নাম দিয়েছিলেন যোগের অনুকরণে: 'আকাঙ্ক্ষা', 'নবসৃষ্টি', 'নিবেদন' এবং 'আধ্যাত্মিক পবিত্রতা!' কটি ফুল সাজিয়ে সাধকদের বলতেন সেইসব ফুলের যোগ-কেন্দ্রিক নাম যুক্ত করে এক একটা শব্দ গঠনে, এবং এতে যাঁর উত্তর মার চিন্তার কাছাকাছি আসত তিনি পুরস্কৃত হতেন (চকোলেট, কাশির বড়ি ইত্যাদি)। যেমন:

> যাঁদের প্রকৃত অর্থে বিনয় আছে, তাঁরা ক্ষমতা পাবেন। (10.10.1929)

> ঈশ্বরকে সপ্রেম কৃতজ্ঞতাসহ আরাধনা কর, তবেই তাঁর ভালোবাসা পাবে। (14.10.1929)

দার্শনিক ভাবাদর্শসমূহের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য বুদ্ধির খেলাও হত। যেমন, যোগ কী? তুমি কী চাও? বোধি; এবং আরো অনেক কিছু। যোগ কী মানবতার জন্যই?—এই প্রশ্নের উত্তরে মা সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন:

> না, ভগবদ্‌সত্তার জন্যই যোগ। মানবধর্মের মঙ্গলের জন্য নয়, ঐশ্বরীয় সত্তার প্রকাশের জন্য আমরা উৎসাহী। তাঁর ইচ্ছা রূপদানের জন্যই আমরা আছি, আরো খোলাখুলিভাবে বলা যায়, আমরা তাঁর ইচ্ছায়ই কর্ম করি যাতে সর্বময় অধিপতির একাত্ম-বিকাশ এবং পৃথিবীতে তাঁর শাসন কায়েমে আমরা নিমিত্ত হতে পারি।[1]

যোগ সম্পর্কিত সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা চলত এবং কথায় কথায় শিষ্যদের যোগ সম্পর্কে নির্দেশাবলী দেওয়া হত। এইভাবেই মা আধ্যাত্মিক কর্মকেন্দ্র হিসাবে আশ্রম পরিচালনা করতেন। সব জাতি, ভাষা ও ধর্মের লোক সেখানে ছিল: প্রবীণ নবীন, ধনী গরীব, সাধনায় পরিণত এবং অনভিজ্ঞরা। সাধনার সঠিক পথনির্দেশ করতে মা একটি প্রতীক বেছে নেন, "ঘুরন্ত চক্র এবং একটি ফোটা ফুলের

---

1. *Words of the Mother*, পৃ: 39–40

মধ্যে ক্রস চিহ্ন।" কাজেই অবিচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততার মধ্যে মার দিন কাটত। তারপর 1931-এর 18 অক্টোবর হঠাৎ তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। সব কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হল এবং ঐ বছরের 24 নভেম্বর ছোটখাট কাজ শুরু করে পুনরায় দায়িত্ব নেন আশ্রমের।

দর্শন

এরপর থেকে মার সেবাকাজে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। সাধকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় আগের মতো বেশি সময় দিতে পারতেন না। সকালের দীর্ঘকালীন ধ্যানের অধিবেশন করা ছেড়ে দিলেন। পরিবর্তে, সকালে পবিত্রর ঘর-সংলগ্ন উত্তরের বারান্দায় বেড়াতে শুরু করলেন। মাকে দেখার জন্য সাধকরা বিপরীত দিকের উঠোনে সমবেত হতেন। পরবর্তীকালে এটা 'বারান্দা দর্শন' হিসাবে অভিহিত হল এবং পরবর্তী ত্রিশ বছর চালু ছিল। শ্রীমাও সকালে নির্বাচিত অল্প কয়েকজনের প্রণাম গ্রহণ করতেন এবং ধ্যান করার হলে আধ ঘণ্টার জন্য সাধকদের সাথে ধ্যান করতেন। বিশেষ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারও হত এবং এসব সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে মহামূল্যবান হিসাবে পরিগণিত হত।

শ্রীঅরবিন্দ নির্জনবাসে ; এমন অবস্থায় আশ্রমবাসীদের কাছে শ্রীমাই ছিলেন এক-মাত্র অবলম্বন। আশ্রমের নিয়মকানুন অনুযায়ী যৌলিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল। স্বামী ও স্ত্রী, পিতামাতা ও পুত্র, সবাইকে নিজের মতো জীবন ধারণের শিক্ষা নিতে হত এবং আধ্যাত্মিকতার ওপর ভর করে থাকতে হত। কিন্তু অহংবোধ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে পারলেই এটা করা সম্ভব ছিল। একজন শিষ্যের কাছে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন :

> ভগবদসত্তার সাথে সম্পর্ক, মার সাথে সম্পর্ক হবে ভালোবাসার, বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতার, সম্পূর্ণ নিবেদনের ; এছাড়া অন্য যে কোনো ধরণের সাধারণ যৌলিক সম্পর্ক সাধনার পক্ষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—কামনা, অহংমুখী অভিমান, দাবি, বিক্ষোভ এবং অজস্র রাজসিক মানবপ্রকৃতির যাবতীয় গণ্ডগোল যার থেকে দূরে সরে আসাই সাধনার মূল উদ্দেশ্য।[1]

---

1. Centenary Edition, সংখ্যা 25, পৃঃ 174

সাধকদের সাথে মার ব্যক্তিগত যোগাযোগ কমে যাওয়ায় তাঁদের ওপর এক প্রয়োজনীয় প্রভাব পড়ে। দৈহিক ও মানসিক বাধা অতিক্রম করে আত্মিকভাবে মার কাছাকাছি আসতে হয়েছিল তাঁদের। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের আকাঙ্ক্ষার জোরের ওপরই এটা করতে হয়েছিল। বোধহয় এটাই সাধকদের এবং শিষ্যদের নানান দিকে সিদ্ধিলাভের সহায়ক ছিল। অবশ্যই কয়েকদিন 'দর্শন দিবস' ছিল—15 আগস্ট, 24 নভেম্বর, 21 ফেব্রুয়ারী এবং পরে 24 এপ্রিল (মার দ্বিতীয়বার পণ্ডিচেরী আগমনের দিন) যুক্ত হয়। এইসব দিনে সাধকরা শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে একত্রে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতেন। সাধকদের কাছে প্রতিটি দর্শন যদি 'এক অভিজ্ঞতা, প্রায় উচ্চমার্গ-সিদ্ধি' হয়, প্রভু ও মার কাছেও এটার গুরুত্ব ছিল। তাঁরা শক্তি বিকিরণ করে দিতেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য রাখতেন সাধকরা তা পাচ্ছেন, না তাঁদের স্বকীয় রাজসিক ও তামসিক প্রাকৃতিক মোহে তা বাতিল করছেন। সুখের কথা, বেশিরভাগ যাঁরা এসেছিলেন, মুক্ত মন হয়ে করুণা পেয়েছেন এবং উপকৃত হয়েছেন। এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিও 'দিব্য মুরথুলু'র শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে নি :

> একজনের হৃদয়ে শ্রীঅরবিন্দের একটিমাত্র দৃষ্টিতেই মন বশীভূত। তাঁর দৃষ্টিতে এক জ্যোতি রয়েছে যা মানুষের আত্মাকে উজ্জীবিত করে এবং আত্মা উদ্দীপ্ত হয়।[1]

একবার দর্শনের পর জে. বিজয়তুঙ্গা লিখছেন :

> সংগঠনের পেছনে, সবকিছুর পেছনে একটিমাত্র ব্যক্তিত্বই বিরাজ করছেন, মা...যুবাকালে সম্ভ্রমপূর্ণা ও সুন্দরী, এবং বুদ্ধিগত উৎকর্ষেও বিশিষ্টা, আজ তাঁর শীর্ণ শরীর অদ্ভুত জীবনীশক্তির প্রতীক, তাঁর দৃষ্টির জ্যোতি পার্থিব নয়। তাঁকে দর্শন করা এবং ফুলের আকারে তাঁর আশীর্বাদ নেওয়া কোনো পৌত্তলিকতা নয়।[2]

অন্যান্য উৎসবেও ধ্যান ও মার সাথে মিলনের সুযোগ ছিল। প্রতি মাসের প্রথম দিনটি ছিল প্রাচুর্যের দিন, ঐদিন সাধকরা মার হাত থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয়

---

1. উদ্ধৃত : *Life in Sri Aurobindo Ashram*, পৃ: 131
2. ঐ, পৃ: 137

দ্রব্যাদি, যেমন কাপড়, স্টেশনারী দ্রব্য নিতেন। খ্রীস্ট দিবসে মা সাধকদের সবুজপত্র দিতেন, একে বলা হত 'নবজন্ম' ; নববর্ষ দিবসের মধ্যরাতে, সমবেত ধ্যান এবং মার অর্গান বাজানো শোনার পর সাধকরা আশীর্বাদ নিতে যেতেন। 'মধ্যরাতের আধো অন্ধকারে মাকে দেখে মনে হত সৌন্দর্যের রাণী',—অনেক বিবরণের মধ্যে একটি।[1] তাছাড়া মার নববর্ষের বাণীর মাধ্যমে শিষ্যদের কাছে তাঁর শক্তি সঞ্চারিত হত। এবং সারা বছর ধরেই সাধকদের সাথে মার পত্রালাপ চলত। এই পত্রালাপের মাধ্যমে অজ্ঞতার মেঘ কেটে যেত ; এই মেঘের প্রকোপেই সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে আবদ্ধ হয়। তাই আত্মহত্যায় উদ্যত কোনো এক যুবকের প্রতি :

> পরবর্তী জীবনের কথা ভেবে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই জীবনে যা আছে সেটাই বিচার্য, এর সবকিছু সম্ভাব্যতা...যতক্ষণ বেঁচে আছি, তার মধ্যে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।[2]

সন্দেহবিষে জর্জরিত এক যুবতীর প্রতি :

> আমার কোন শিশুই অর্থহীন নয় ; বাস্তবে আমার প্রত্যেক শিশুরই স্থান আছে এবং জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এদের সবাইকেই আমি সমান-ভাবে ভালোবাসি এবং উন্নতি ও ভালোর জন্য যার যা প্রয়োজন তা আমি করি, এ ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব করার প্রশ্ন নেই।[3]

ত্রিশের দশকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাকাব্য "সাবিত্রী" রচনায় হাত দেন। এই কাব্যে তিনি নিজের ও শ্রীমার যোগ কবিতার রূপকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। 5 ডিসেম্বর 1967 এক আলাপে শ্রীমা 'সাবিত্রী'-র বহুবিচিত্র উপাদানসমূহ (দুজ্ঞেয়বাদ, আলঙ্কারিক তাৎপর্য, দর্শন, ইতিহাস) উল্লেখ করে বলেন :

> এসবই তাঁর (শ্রীঅরবিন্দের) নিজের অভিজ্ঞতা, এবং আশ্চর্যের বিষয় যে আমারও একই অভিজ্ঞতা...এবং দিনের পর দিন একই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার ; সকালে তিনি যেসব অভিজ্ঞতার কথা আমায় বলতেন, আমি আগের রাতেই ঠিক একই অভিজ্ঞতা, একেবারে হুবহু দেখেছি। হ্যাঁ, সব বিবরণ, বর্ণ,

---

1. রমেন পালিত, *Breath of Grace*, পৃঃ 93
2. *Some Answers from the Mother* (1964), পৃঃ 45
3. বর্ধিত সংস্করণ *The Rose* (1964), পৃঃ 2

ছবি যা আমি দেখেছি, যেসব কথা শুনেছি, সব, সবকিছু তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে, এক অলৌকিক কাব্যে তা মূর্ত হয়েছে ।[1]

'সাবিত্রী'-র বিবরণ নিঃসন্দেহে শ্রীমার সেবা ও ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণায় বিধৃত হয়েছে।

শ্রীমার জীবন ও কর্মধারা বিচার করলে দেখা যাবে 'সাবিত্রী' ও মার রূপের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য, যেমন নীচের পংক্তিগুলি :

উৎফুল্ল গতিময় নবীন প্রজ্ঞা চেতন
পৃথিবীর উদারতায়, দিব্য এষণায়
আগত বাণীর পথে ডাকে বানভাসি
শান্ত উজ্জ্বল জীবনের স্রোত ঠেলে বুকে।
আত্মপ্রজ্ঞা দিয়ে গড়া বজ্র প্রত্যয়
মন তাঁর শুভ্র সমুদ্র বিশাল,
আবেগ স্বচ্ছ ধারা ঢেউ পরে ঢেউ
আঁখি, হাসি স্বর্গালোক মাটির শরীরে
মানুষের জীবন দানে অলৌকিক প্রভায় ।[2]

যুদ্ধের বছরগুলি

1938-এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করে ; ঐ বছরটি ছিল মিউনিখ চুক্তি অবমাননার বছর। ইউরোপের যুদ্ধের ছায়া পণ্ডিচেরীতেও প্রভাব ফেলে। যাই হোক, মানবতা-ধ্বংসের হোতা নাজী দৈত্যদের কার্যকলাপে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা নীরব সাক্ষী থাকতে পারেন নি। তাঁরা আধ্যাত্মিকভাবে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রতি-আক্রমণের আহ্বান জানান। 23 নভেম্বর 1938-এর শেষ রাতে

1. *Sri Aurobindo Circle* 32তম সংখ্যা (1976), পৃঃ 4
2. *Savitri* (1954), pp 18–19

শ্রীঅরবিন্দ পড়ে গিয়ে আঘাত পান। পরে শ্রীমা ব্যাখ্যা করে বলেন, দুজ্ঞে'য় জগতের প্রতিকূল শক্তির জন্যই এটা হয়েছিল। তিনি সব কাজ স্থগিত রেখে শ্রীঅরবিন্দের নিরাময়ের জন্য শুশ্রূষা করতে লাগলেন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে উপস্থিত ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে যান। সকাল সন্ধ্যায় শুশ্রূষাকারীদের সাথে শ্রীঅরবিন্দের আলোচনায় তিনি যোগ দিতেন এবং আত্মমগ্ন মোহিত অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ফুলদানীতে ফুল সাজাতেন। এটা প্রত্যক্ষ ছিল যে স্বকীয় আধ্যাত্মিক তপস্যার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের কাজ করছিলেন। কিন্তু 1939-এ হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। 1939-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। 1940-এ মিত্রশক্তির পক্ষে পরিস্থিতি জটিল হওয়ার সময়ে তিনি ও শ্রীঅরবিন্দ যুক্তভাবে মিত্রশক্তির পক্ষে তাঁদের সমর্থন জানিয়ে মাদ্রাজের রাজ্যপালকে পত্র দেন। যুদ্ধকার্যে সহায়তার জন্য প্রতীক অর্থসাহায্যও দেন। তাঁদের এই প্রকাশ্য সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে মার বহু শিষ্য ও তাঁদের সন্তানরা যুদ্ধে সহায়তার জন্য প্রতিরক্ষা-বাহিনীতে যোগ দেন। এব্যাপারে যখন শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে এই মর্মে সমালোচনা হয় যে যেহেতু শ্রীমা ফরাসী সেজন্যই শ্রীঅরবিন্দ মিত্রপক্ষ সমর্থক, তখন শ্রীঅরবিন্দ সমালোচকদের শান্ত করেন। একজন উদ্বিগ্ন শিষ্যকে মা বলেন :

> যখন দেখছ প্রতিবেশীর বাড়ীতে আগুন লেগেছে এবং যেহেতু সে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে সেজন্য তুমি আগুন নেভাতে সাহায্য করছ না, তাতে তুমি নিজের জীবন ও বাড়ী জ্বলে যাওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছ। আধ্যাত্মিকতার পক্ষে কোন্ শক্তি আর কোন্ পক্ষ অসুরশক্তির হয়ে কাজ করছে তার পার্থক্য বুঝতে পারছ না...চার্চিলও একজন মানুষ। তিনি স্বকীয় প্রকৃতি রূপান্তর-কামী যোগী নন। বর্তমানে অসুরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতির আত্মার তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁকে পথনির্দেশ দিচ্ছে এবং তাঁর মন তাতে অদ্ভুতভাবে সাড়া দিচ্ছে। মিত্রপক্ষের বিজয়, যা শেষে আসবেই, তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।[1]

আশ্রমবাসীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ায় এবং যুদ্ধকালীন বহু নিয়ন্ত্রণ ও ঘাটতির জন্য আশ্রমের জীবনেও উদ্বেগ দেখা দেয়। কিন্তু মার কাজ বিনা বাধায় চলতে থাকে।

1. *Mother India,* ফেব্রুয়ারী 1973, পৃঃ 122

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবের প্রতি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার সমর্থনের বিরুদ্ধেও কিছু আশ্রমবাসী সমালোচনা করেন। কিন্তু চার্চিল 1940 সালে ডানকার্ক পতনের পর যখন যুগ্ম-জাতীয়তার প্রস্তাব দেন, মা 1942-এর ভারতের সাথে ফ্রান্সের পরিস্থিতি তুলনা করেন :

> মনুষ্যসৃষ্ট কোন কিছুই ত্রুটিহীন নয়, কারণ মানুষের মনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তবু এই প্রস্তাবের (ক্রিপসের) পেছনে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ রয়েছে। তাঁর করুণা ভারতের দ্বারপ্রান্তে সাহায্য দেবার জন্য উপনীত...কিন্তু যদি তা প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তাঁর আর করুণা পাওয়া যাবে না এবং তখন জাতিরই দুর্ভোগ বাড়বে, সে দুর্যোগ পরিব্যাপ্তও হবে।[1]

দুর্ভাগ্যবশতঃ, শ্রীঅরবিন্দের সমর্থন সত্ত্বেও ভারতের রাজনৈতিক নেতারা ঐ প্রস্তাব বাতিল করে দেন, ফলে 1947-এর দেশভাগজনিত দুঃখ ও বিভীষিকার পথ প্রস্তুত হয়। জাতীয় স্তরে এই ব্যর্থতা ছিল, তবে আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটের চেহারা ভালোর দিকে যায়। 1945-এ অসুরীয় হিটলার এবং নাজী বাহিনী ও সহযোগী ফ্যাসিস্টদের পরাভূত করে মিত্রশক্তি জয়যুক্ত হয় এবং বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

শিশুদের আগমন

আশ্রমের ভেতর মা সাবধানে কাজ চালাতেন। যুদ্ধের হিংসার বিপরীত দিক হিসাবে অনেক আশ্রমবাসীই প্রত্যহ প্রার্থনা ও প্রীতির কাজ হিসাবে ফুল সংগ্রহ করতেন, এবং এর কারণও ছিল পরিষ্কার :

> দুঃখ-ব্যথায় বিদ্ধ মানুষের কাছে ফুল হচ্ছে স্রষ্টার আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ। ফুলের মাধ্যমেই স্বর্গের ঐশ্বর্য পৃথিবীর ওপর বর্ষিত হয়, সহস্র লক্ষ রূপে ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও গৌরব প্রকাশিত হয়।[2]

---

1. উদ্ধৃত : কে. এন. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের অপ্রকাশিত *Biography of the Mother.*
2. নারায়ণ প্রসাদ, *Life in Sri Aurobindo Ashram* (1965), পৃঃ 60

মা নিজে 700 র বেশি ফুলকে আধ্যাত্মিক ও ভাবগত তাৎপর্য দিয়েছেন, তবে জাতির সহজাত ভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা করেছেন :

> যেমন, প্রাচ্যে পদ্ম হচ্ছে সম্পূর্ণতা ও জ্ঞানের প্রতীকবাহী। মার কাছে পদ্ম 'ভগবদ্‌সত্তার' প্রতিনিধি। ভারতে সব প্রার্থনায় তুলসী অপরিহার্য, মা তাকে বলেন 'উৎসর্গ'। Forget Me Not ফুল মার কাছে 'চিরস্থায়ী স্মৃতি'।[1]

এভাবেও মা অভূতপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ফুলের জগতের সাথে সাধকদের সাধনার সাযুজ্য এনেছিলেন :

> অরণ্যের মধ্যে অসংখ্য বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্ম আলো পাবার জন্য কীভাবে লড়াই করে তা কখনো লক্ষ্য করনি? সূর্যের আলো পাবার জন্য গুটিয়ে, ঘুরিয়ে কতভাবে তারা চেষ্টা করে! দৈহিক ক্ষেত্রেও একইভাবে আকাঙ্ক্ষার অনুভব দেখা দেয়—স্পৃহা, চলা, আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া...নিশ্চিতভাবে আলো হচ্ছে ঈশ্বরের বস্তুগত প্রতীক, এবং বস্তুগত পরিস্থিতিতে সূর্য সর্বময় ভগবদ্‌চেতনার প্রতীক।[2]

যুদ্ধের ফলে বহু শিশুও আসে—"ভগবদ্‌চেতনার উদ্যানে ফুলগুলি" আশ্রমে এসেছে, শ্রীঅরবিন্দ এইভাবেই বলতেন, এবং এতে আশ্রমজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। শ্রীমা আনন্দে শিশুদের স্বাগত জানান। 1953-সালে যেমন তিনি বলেছিলেন :

> যুদ্ধের পরই শিশুদের নেওয়া হয়েছিল। তাদের নেওয়াতে আমার দুঃখ নেই। কারণ আমি বিশ্বাস করি, এইসব শিশুদের মধ্যে ভবিষ্যতের অনেক কিছু নিহিত; বড়োদের মতোই তারা কিছুই জানে না, তবে বড়রা মনে করেন যে তাঁরা সব জানেন।

এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক কর্মতৎপরতা বলে এবং সবকিছুতে দৃষ্টি থাকার গুণে মা শিশুদের জন্য শয়নাগার, খেলার মাঠ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। 1943 সালের 2 ডিসেম্বর, শ্রীমা আশ্রমের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর তত্ত্বাবধানে

---

1. দ্র: *Note to Flowers* (1966)
2. ঐ

ছিলেন পবিত্র ও শিশিরকুমার মিত্র, সেখানে ছাত্র ছিল 20 জন। আশ্রমের মতো বিদ্যালয়ও শীঘ্রই বড় হয়ে উঠল। মা নিজে শিশুদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেন, নিজে ক্লাস নিতেন, খেলাধুলায় যোগ দিতেন এবং গল্প বলতেন। নবীন সাধকদেরও তিনি শিশুদের জীবনে সহযোগী করে তুলেছিলেন যাতে শিশুরা তাড়াতাড়ি ভবিষ্যতের নায়ক হিসেবে গড়ে ওঠে। শরীরচর্চার ওপর জোর দেওয়াটা শিশুদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। এতে তাদের মনের বিকাশও ঘটছিল।

যুদ্ধ শেষ হ'লে শান্তি আসে সাময়িকভাবে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের আকারে সংঘর্ষ চলছিলই। ভারতেও ওই সময় দেখা দিল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিধ্বংসী রূপ। শ্রীঅরবিন্দের 75তম জন্মদিবস, 1947 সালের 15 আগস্ট এল দেশভাগের মধ্য দিয়ে। এই যুক্ত ঘটনায় শ্রীমার প্রতিক্রিয়া ছিল সরব :

> এটা সমাধান নয় তা পরিষ্কার। এ-ও এক অগ্নি-পরীক্ষা। সৎনিষ্ঠভাবে এর মধ্য দিয়ে চলতে পারলে আমরা দেখতে পাব—দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করে তার ঐক্য ও মহত্ত্ব অর্জন করা যায় না; পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাতেও সমৃদ্ধি আনা যায় না। এক আদর্শকে অন্য আদর্শের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এসব সত্ত্বেও, ভারতের আত্মা এক। ঐক্যবদ্ধ ও অবিভাজ্য ভারতের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে, আমাদের আওয়াজ হবে :
>
> ভারতের আত্মা চিরন্তন হোক ![1]

দেশভাগের পরিণতিতে দুঃখদুর্দশার চিত্র দেখে ব্যথিত শ্রীমা সহস্র দুঃখী মানুষের জন্য একটি প্রার্থনা লিখলেন :

ও মোদের মা, আত্মা ভারতের
তমসাতম বিষাদক্ষণে
ক্ষণিকের তরে ত্যজনি কোন সন্তানে
এমনো ক্ষণে অবাধ্য সন্তান যখন
ফিরায়েছে মুখ ভিন্ন বাণীর শ্রবণে সেবায়
এবং এখন, উত্থিত হৃদয় মুখাবয়ব দীপ্তিময় যখন
মুক্তির লগ্ন উষায়
পুণ্যলগ্নে প্রণম্য হই।

---

1. উদ্ধৃত : Sri Aurobindo : A Biography and a History (1972), পৃ: 1285–86.

আমাদের পথ দেখাও যাতে মুক্তির দিগন্ত আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়
প্রকৃত মহত্তের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দাও
এবং মহাজাতিসমূহের সম্মেলনে তোমার সত্য জীবন প্রতিষ্ঠিত হোক।
আমাদের পথ দেখাও যাতে আমরা সবসময়
মহান আদর্শের দিকে থাকতে পারি
এবং তোমার প্রকৃত রূপ সবার কাছে তুলে ধরতে পারি,
আধ্যাত্মিকতার পথে একজন নেতা হিসাবে
এবং সব মানুষের বন্ধু ও সহায়ক হিসাবে
তুমি আমাদের পথ দেখাও।[1]

আধ্যাত্মিক দৃঢ়তার সাথে তিনি অরবিন্দ আশ্রমে ভারতের আধ্যাত্মিক পতাকা উত্তোলন করেন। এই পতাকায় কেন্দ্রস্থলে মার প্রতীকসহ ভারত, পাকিস্থান, বর্মা ও সিংহলের চিত্র একসাথে রক্ষিত। 1947-এর 15 আগস্ট বিকেলে নীচের বারান্দার সংলগ্ন নীচু দালানে দাঁড়িয়ে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত শোনেন এবং সমবেত প্রার্থনাকারীদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে 'জয় হিন্দ' বলেন। এইভাবেই দেশভাগের মুহূর্তেই মা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথা বলে আশার আলো দেখান। এই ঐক্যের প্রতীকই তো ছিল আশ্রম, এখানে বিভিন্ন রাজ্য ও বিদেশ থেকে সাধক ও শিশুরা আসতেন ও একসাথে মিলেমিশে থাকতেন। মা আশ্রম-জীবনে আরো নতুনত্ব আনলেন। আশ্রমের খেলাধুলায় তিনি নিজে অংশ নিতেন, টেনিস, টেবিল টেনিস খেলতেন। সমুদ্রের ধারে খেলার মাঠ হওয়ায় আশ্রমবাসীরা খেলাধুলা, সাঁতার ও এ্যাথলেটিকসে যোগ দিতে উৎসাহী হন। মার টেনিস খেলা ছিল দেখার মতো জিনিস। নীরোদ বরণের কথায়:

ঐ বয়সে তিনি খুব ভাল খেলতেন এবং যুবাবয়সে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন বলে তাঁর দাবি তীব্র স্থিরলক্ষ্যের ফোরহ্যাণ্ডের মারে সপ্রমাণিত। স্বাভাবিকভাবেই তিনি বেশি ছুটতে পারছিলেন না, কিন্তু তাঁর উদ্যম ছিল প্রচণ্ড। তাঁর দৃষ্টিতে দৈহিক ও মানসিকভাবে টেনিস হচ্ছে শ্রেষ্ঠ খেলা। শুধু দৈহিক সক্ষমতার জন্য নয়, অন্য সবকিছুর মতো খেলোয়াড়দের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক ক্রিয়া প্রসারের জন্য একে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন।[2]

---

1. কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের *On the Mother* থেকে উদ্ধৃত।
2. *Twelve Years With Sri Aurobindo*, পৃ: 86-87

মা পোষাকে ও খেলাধুলায় সবার জন্য একই ধরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং এতেই যৌনচেতনার অবলুপ্তি হয়। যাঁরা দ্বিধাজড়িত ছিলেন, তাঁদের মা বোঝাতেন নারীদের সবল হওয়া কত প্রয়োজন, পুরুষের মতো শক্ত ও স্বাস্থ্যবান হতে হলে ছোট বয়সেই শরীর-শিক্ষণ শুরু করা দরকার। নারীর সৌন্দর্য তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন :

> শক্তি, কোমলতা ও অঙ্গসৌষ্ঠবের নিখুঁত সামঞ্জস্য, সহনশীলতা ও সামর্থ্য, সৌন্দর্য ও শক্তির সামঞ্জস্য এবং সর্বোপরি, সুন্দর স্বাস্থ্য, যা অপরিবর্তনীয় ও অটুট থাকে, নিষ্কলুষ আত্মা, জীবনে আস্থা এবং আধ্যাত্মিক করুণায় অগাধ বিশ্বাসের পরিণামেই হওয়া সম্ভব।[1]

আশ্রমে খেলাধুলায় বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় যখন প্রশ্ন উঠল, শ্রীঅরবিন্দ এই বলে তাঁদের সন্দেহ দূর করলেন যে, জীবনের সবকিছু নিয়েই যোগ, এবং প্রাচীন ভারতের আশ্রমেও কুস্তি ও তীর ছোঁড়ার জন্য শিক্ষণ দেওয়া হত। মা খেলাধুলার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এই কথায় তিনি বললেন, 'যদি তিনি এইসব (খেলাধুলা) সংগঠনে ব্যস্ত থাকেন—তবে এটা সত্যি নয় যে তিনি শুধু এটা নিয়েই আছেন—তা তিনি করছেন একাজটা যথাশীঘ্র শেষ করার জন্যই, তারপর তাঁকে ছাড়াই, আশ্রমের অন্যান্য ক্ষেত্রে যা হয়, এ ব্যাপারেও সবকিছু আপনা আপনিই চলে যাবে।[2] তা ছাড়া, মার দৈনন্দিন কাজের একটা নির্ঘণ্ট তিনি দিয়ে দিয়েছেন, এবং এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি এর সবকিছু ত করবেনই, তার ওপরেও অনেক কিছু করেন যার সংখ্যা সত্তরের বেশি :

> প্রত্যূষ থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মার সারা সময় যায় সাধনা সম্পর্কিত কাজগুলিতে—তাঁর নিজের নয়, সাধকদের নানা কাজে—প্রণাম গ্রহণ, আশীর্বাদ, ধ্যান এবং কোনো সময়ে সিঁড়িতে বা অন্যত্র সাধকদের স্বাগত জানান যা অনেক সময়ে দুঘণ্টাও স্থায়ী হয়, এবং তাঁদের কথা শোনা ও সাধনা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, তাঁদের কাজের ফলাফল জানা, অভিযোগ, দ্বন্দ্ব ও বিবাদ, সবধরণের কাজে সম্মেলন করা এবং সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া—

1. *To Women About Their Body* (1960), পৃঃ 8
2. Centenary Edition, সংখ্যা 26, পৃঃ 505

কাজের তালিকার আর শেষ নেই ; বাকী সময়ে তাঁদের চিঠিপত্র দেখা, আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের বৈষয়িক বিষয়সমূহ সম্পর্কে রিপোর্ট নেওয়া, পত্রালাপ করা এবং বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ; এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঝামেলা ও অসুবিধার মোকাবিলা করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করার ব্যাপারও ছিল ।[1]

কর্মসন্ন্যাসযোগ

মা প্রয়োজন মতো আশ্রমের কাজকর্ম বাড়াতে লাগলেন। চল্লিশ দশকে গুরুত্বপূর্ণ অতিথিশালা 'গোলকণ্ডে' তৈরী হয়, এবং অরবিন্দ আশ্রম প্রেসের মতো সংগঠনও গড়ে ওঠে। সবকিছুই মার তত্ত্বাবধান ও পরামর্শমতো হোত। পরে অবশ্য ব্যক্তিগত নির্দেশাবলীর জন্য আশ্রমের কর্মীরা মার কাছে যেতে পারতেন না। এই বিধিনিষেধ সম্বন্ধে মা নিজে বলেছেন :

> আগে আমি সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতাম। আমার অনুমতি ও জ্ঞাতসারে ছাড়া কিছু করা যেত না। পরে আমি অন্যভাবে কাজ করার পথ নিলাম। খুঁটিনাটি সব বিষয় ছেড়ে দূরে থাকতাম, সবাইকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথার্থ প্রেরণা দিতাম।[2]

শ্রীমা সবসময়ে সাধকদের উৎসাহ দিতেন কাজে ত্রুটিমুক্ত হয়ে নিখুঁত হবার জন্য :

> বিশেষ উদ্দেশ্য তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, যুক্তি জীবনের অস্তিত্বকে অর্থপূর্ণ করে করে তোলে এবং এই যুক্তিই কর্মপ্রচেষ্টার উৎস এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যেই আনন্দ পাওয়া যায়।
>
> ঠিক তাই। কর্মপ্রচেষ্টাতেই আনন্দ পাবে...অলস প্রকৃতির লোকেরা আনন্দের মুখ দেখতে পায় না—আনন্দ পাবার মতো শক্তিও তাদের নেই। প্রচেষ্টাই আনন্দ দান করে।[3]

---

1. ঐ, পৃ: 508
2. উদ্ধৃত : *Life in Sri Aurobindo Ashram*, পৃ: 29
3. *Bulletin*, ফেব্রুয়ারী 1964, পৃ: 41

আশ্রম ও অন্যত্র কর্মীদের তিনি নিষ্কাম কর্ম ও ঈশ্বরের সেবায় কাজ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটাই কর্মসন্ন্যাসযোগ-এর কার্যকরী আদর্শ, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। সাধকরা যদিও বিভিন্ন কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তবু শ্রীমা ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে স্বকীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। একই সময়ে এতগুলি ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে যাওয়া সত্যিই প্রলম্বিত অলৌকিক ইচ্ছাশক্তির পরিচয়বাহী। ঐ সময়ে মা এত শীর্ণকায় দুর্বল দেখতে ছিলেন এবং কোনো কোনো রাত্রে একঘণ্টাও ঘুমোবার অবকাশ পেতেন না এবং সহজভাবে দেওয়া প্রস্তাবও তিনি গ্রহণ করতেন না। নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যই তাঁর সব কাজ ও বেঁচে থাকা! ধৈর্যশীলা, করুণাময়ী মা কারোকে বিমুখ করতেন না এবং তাঁর আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা ও উদ্বেগ নিয়ে সবসময় চিন্তা করতেন :

> সেই রোগা শরীরে চোখ যেন বাস্তব জগতের জানালা স্বরূপ, কথায় বাস্তবের প্রতিধ্বনি, যাঁর পদধ্বনির মধ্যে রয়েছে অস্তিত্বের ছন্দময় স্পন্দন, তিনি নারীও বটেন, একজন সদাশয় গৃহকর্ত্রী। খেলার মাঠে স্বর্গীয় সাথীর মতো—এবং হঠাৎ প্রভুর আবির্ভাবের সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়লে স্বর্গীয় দর্শন ঘটে যেন। তিনি অবিমিশ্র প্রহেলিকা, সর্বদা শেষ আশ্রয়স্থল, করুণার মূর্ত প্রতিভূ।[1]

ভবিষ্যতের পথে

শ্রীমা সৃজনশীল লেখিকা ও শিল্পীও ছিলেন। তিনি লিখতেন এবং মৌলিক নাটক প্রযোজনা করতেন। প্রথম নাটক 'ভবিষ্যতের পথে' (Vers L' Avenir), আশ্রম-বাসীরা তা মঞ্চস্থ করেন 1949 সালের পয়লা ডিসেম্বর। এই প্রতীকধর্মী একাঙ্ক নাটকে চরিত্র ছিল পাঁচজনের : তিনি, কবি, অতীন্দ্রিয় সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী। 'তিনি' কবিকে বিবাহ করেন এক প্রেমময় জীবনযাপনের জন্য, পাঠ্যাবস্থা থেকেই এই জীবনের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত প্রেম পেলেন না, তবে

---

1. কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের *On the Mother.*

পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিবাহজীবন অটুট থাকল। তিনি 'নির্যাতিত মানবতার সেবায় কাজ করার কথা বললেন, মানুষের স্বকীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তার রূপান্তর সাধনের জন্য আত্মনিয়োজিত হবেন বললেন।' তাঁর কবি-স্বামীও একই রকমভাবে অসুখী ছিলেন। স্ত্রীর মধ্যে তিনি এমন স্বর্গীয় জ্যোতি দেখতেন যাতে তাঁকে সম্মান করা যায়, ভালবাসা যায় না। এ-যেন আন্মা কারাইকলের পরিচিত কাহিনীর মতো—তাঁর আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব দেখে তাঁকে মানবী-স্ত্রী হিসাবে কল্পনা করতে পারতেন না তাঁর স্বামী। কবি সঙ্গীতজ্ঞের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তিনি মধুর কণ্ঠে গাইতেন। সঙ্গীতজ্ঞ সাড়া দিলেন এবং কবির সাথে সর্বদা একত্রে থাকতে চাইলেন, কিন্তু কবি বিবাহিত জেনে তিনি আঘাত পেলেন। এই সময়ে নায়িকার আবির্ভাব এবং কবি ও সঙ্গীতজ্ঞের সাথে যোগ দিয়ে তাঁদের বললেন, শুধু দৈহিক মিলনের জন্য নয়, মহান চরিত্রের ও সদাশয় কাজে সম্পৃক্ত প্রকৃত প্রেমের জন্য তাঁদের একত্র হতে আহ্বান জানালেন। তিনি তখন তাঁদের জীবন থেকে সরে স্বর্গীয় প্রেমের সন্ধান করতে গেলেন :

> 'চরম সত্তায় বোধিপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি ও সাহায্য হয়ত একদিন আসবে, জৈবিক সত্তার সেই রূপান্তর, অধ্যাত্মিকরণ সম্ভব হবে যা সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যতানময়, আলোকজ্যোতিসম্পন্ন, শান্তি ও সৌন্দর্যের ভূমিতে পরিণত করে তুলবে।'

এটা পরিষ্কার যে নাটকটি আত্মজীবনীমূলক, কারণ নায়িকার মধ্যে শ্রীমার বিশ ও ত্রিশবর্ষীয় কালের চরিত্র চিত্রিত। স্বর্গীয় প্রেমের জন্য নায়িকার আকাঙ্ক্ষা যার দ্বারা এই পৃথিবীকে আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, শ্রীমার স্বপ্নের সাথে এর মিল আছে, পণ্ডিচেরীতে থেকে শ্রীঅরবিন্দের সহযোগে রূপান্তর-সাধনের যোগ করার সিদ্ধান্ত এইভাবেই প্রতীকী রূপে নাটকে উপস্থাপিত। *Prayers and Meditations*-এ শ্রীমা 31 মার্চ, 1917 সালে লিখছেন :

> বলুন, আপনি কী অদ্ভুত শক্তি দিয়ে আকাঙ্ক্ষী হৃদয়ে আলো দেখাবেন, আপনার স্বর্গীয় উপস্থিতি সম্বন্ধে মানুষের চেতনা জাগ্রত করবেন, এই নিষ্করুণ দুঃখী পৃথিবীতে আপনার সত্য সুন্দর শিবের স্বর্গীয় উদ্যান সম্বন্ধে সচেতন করবেন ?...
>
> হে প্রভু, কখনোই আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে নিষ্ফল হই নি। কারণ আমি যা আপনাকে বলি তা ত আপনিই আমাকে দিয়ে বলান।

পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সংঘটিত একটি বিবাহ মা মঞ্জুর করেছিলেন, যদিও তিনি মনে করতেন যে এটা প্রকৃতি, জ্ঞানের নিম্ন পর্যায়ের ; মনের সাথে প্রকৃত বিবাহবন্ধন একমাত্র ঈশ্বরপ্রেমের রাজত্বে সম্ভব, এটা বিজ্ঞান যেখানে একজনের লক্ষ্য অনুভূতির সাথে অর্জিত হতে পারে। উচ্চস্তরের প্রকৃতি বা বিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্ব টিঁকে আছে : জীবভূতম মহাবাহো যাযেদাম ধার্যতে জগৎ, গীতায় একথাই বলা হয়েছে (VII, 5)। পুত্র আঁদ্রের শিশুবয়সেই মা তাকে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য পালনের কথা বলেন। তিন দশক তাকে না দেখার পর মা আঁদ্রের সাথে মিলিত হন 1949-এর নভেম্বরে। শ্রীঅরবিন্দকে আঁদ্রের আসার কথা বলেও ছিলেন :

> বোধহয় রাস্তায় দুজনের দেখা হলে তাকে চিনতেও পারতাম না, সে-ও আমায় চিনত না...সে আপনার বই পড়ে এবং বোঝেও। তার স্ত্রীর ছবি সে পাঠিয়েছে, আমার সাথে মিল আছে। আঁদ্রেও আমায় লিখে জানিয়েছে যে নিজেও আমার মতো দেখতে। একথা সত্য।[1]

গোলকণ্ডেতে মা ও আঁদ্রের সাক্ষাৎ হয় এবং আঁদ্রের ধারণা হয় : 'সাথে সাথেই আমাদের মধ্যে বোঝপড়া হয়ে গেল এবং আমার মনে হল এখনো আমি বাচ্চা আছি এবং মার কোলে আশ্রয় খুঁজছি।' আশ্রমের কাজে সামগ্রিক রূপ দেখে আঁদ্রে অবাক হয়ে যায়।

সর্বকালের কাহিনী

আশ্রমে মার নিজের কাজই ছিল জাঁকজমকপূর্ণ সচিবালয়ের কাজ। টাকার অভাব সবসময়ের সমস্যা ছিল। রোজ কিছু সময় শিশুদের জন্য দিতে হত, কারণ এরাই তো ভাবী অগ্রদূত-বাহিনী। এইসব অধিবেশন থেকে তাঁর গল্প ও উপকথার সংগ্রহ Tales of All Times।

এই সংগ্রহের ভূমিকায় মা বলছেন :

1. *Champaklal Speaks*, পৃঃ 91

শিশুদের নিজেকে খুঁজে নিতে সাহায্য করার জন্যই এই গল্পগুলি লেখা এবং তারা যাতে সত্য ও সুন্দরের পথ অনুসরণ করে তা দেখা।

F. J. Gould-এর Youth's Noble Path-এর অনুসরণে এই গল্পসমূহ বিশ্বের সব দেশ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল ; এইসব উপকথা মার অননুকরণীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রসে সম্পৃক্ত হয়। সব গল্পের মূলে ছিল এক মহান আদর্শ এবং আত্মজ্ঞান যা কিনা আত্মসংযম দিয়ে শুরু, তার ওপর জোর দেওয়া হয় :

> কাজেই তোমার বাবা মা বা শিক্ষক যখন তোমাকে সংযত হতে বলেন, তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা মনে করেন তোমার ত্রুটিগুলি অসংশোধনীয় ; তাঁরা জানেন যে তোমার অসংযত ও উৎসাহী মন ঠিক নবশিক্ষিতের মতো, তাকে শাসন করে সংযত করতে হবে।[1]

এতে গীতার কথা মনে পড়ে যায় : VI, 5 :

> নিজের সত্তা দিয়েই মানুষের ওপরে ওঠা উচিত, কাজেই এই সত্তাকে সে যেন দুর্বল না করে। কারণ এই সত্তাই মানুষের নিজের বন্ধু এবং এই সত্তাই তার শত্রু।

মার কথায় গীতার আদর্শ সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে, শিশুদের বোঝাবার জন্য তিনি এর জীবনদর্শন তুলে ধরেন :

> তীরন্দাজ তার তীরের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং পাইলট তার জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করে ; স্থপতি বাড়ীর গঠনকর্ম তত্ত্বাবধান করে, কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ আত্মসংযমী হন...প্রশংসা পেলে তিনি নিস্পৃহ থাকেন ; দোষারোপে বিরক্ত হন না। সঠিক আইনের ভিত্তিতে কাজ করতে ভালবাসেন এবং শান্তিতে বাস করেন।
>
> সদিচ্ছাপরায়ণ শিশুরা, তোমরাও সংযমী হতে শিখবে ; এবং তেমন খারাপ অবস্থা হলে অসন্তুষ্ট হয়ো না, নিজেদের মেজাজ ঠিক রাখবে।[2]

মা ভালো জিনিসগুলির বর্ণনা দেন যা সাহস, আত্মনির্ভরতা, প্রসন্নতা, অন্যকে

---

1. *Tales of All Times* (1964), পৃঃ 2
2. Tales of All Times (1964), পৃঃ 7–8

সাহায্য করা, ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং বিজ্ঞতার মতো গুণাবলী থেকে আসে। সৎনিষ্ঠা অবশ্য সবচেয়ে বড় গুণ, এর থেকেই শরীরে সত্যের প্রকৃত আভাস পাওয়া যায় :

> সৎ মানুষের সত্য কথা বলার জন্য সলোমনের সিংহাসনের ঐশ্বর্যের দরকার হয় না। সত্য তার হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, এই হৃদয়ই সত্যকথা বলায়। সে কোনো শিক্ষকের বা প্রভু, বিচারকের ভয়ে সত্য কথা বলে তা নয়, অকপট ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবেই সত্যবাদী, এটাই তার চরিত্রের গুণ।[1]

শিশুদের স্বনির্ভর হওয়া শিখতে হবে কারণ অন্যের ওপর সবসময়ে নির্ভর করলে তারা এগোবে কীভাবে? আলাদীনের প্রদীপের মতো অলৌকিক ঘটনার কথা শুনি, কিন্তু মা বলেন :

> আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে যা মানুষ নিজের চেষ্টায় ঘটাতে পারে : এতেই পৃথিবী ফলের আচ্ছাদনে পূর্ণ করে এবং জঙ্গলের জন্তুদের নিস্তেজ করে ; ইহাই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা কাটে এবং শহর, সেতু এবং বাঁধ তৈরি করে ; এর দ্বারাই সমুদ্রে জাহাজ চলে এবং আকাশে বিমান ওড়ে ; এতে সবার মনে নিরাপত্তাবোধ ও স্বস্তি আসে।
>
> স্বকীয় উদ্যমই মানুষকে মহান, বিবেচক ও দয়ালু করে তোলে। এতেই প্রগতি নিহিত।[2]

তামিল নীতিবাদী তিরুভাল্লুভুর ও তাঁর বোন আব্বাই-এর কাহিনী বলতে গিয়ে শ্রীমা অশুভের নাশ এবং ছল-চাতুরী ত্যাগ করে চলার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বললেন। উদ্দীপক বক্তৃতার শেষাংশে মা শিশুদের আহ্বান করলেন বিজয়ী নায়ক হওয়ার জন্য :

> সমুদ্রের ঢেউ ও বাতাসের রোষ প্রতিরোধে শক্ত জাহাজ
> তৈরি করতে দাও
> জ্বরের দৈত্যাবাস ভয়ঙ্কর জলাভূমিকে নির্জলা শুষ্ক করতে দাও।
> জঙ্গলের হিংস্র জন্তু যেখানেই তার নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করুক
> তাদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করুক।

---

1. ঐ, পৃ: 55–56
2. ঐ, পৃ: 31

অসুস্থতা ও যন্ত্রণার নির্বাসন দিতে সে যোগ্য ডাক্তার গড়ে তুলুক।
ক্ষুধার জনক দারিদ্র্য উচ্ছেদে সে চেষ্টা করুক কারণ
দারিদ্র্যই তো শিশুর অনাহারে কত মাতার অশ্রু ঝরায়।
তাকে অবিচার, দ্বেষ ও পাপাচার উচ্ছেদ করতে দাও
এরাই সবার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।[1]

মা সব শিশুকেই জীবনের সবকিছু ও সৌন্দর্য উপভোগ করার আহ্বান জানাতেন এবং সর্বোপরি: 'সপ্রেম হৃদয়ের প্রতি মনোযোগ দিও, সৎ চিন্তার আধার মন এবং বিশ্বস্ত কাজের হাতিয়ার হাতের প্রতি যত্ন নিও।'[2]

বাড়ন্ত শিশুদের পক্ষে সব পৃষ্ঠাই ছিল মূল্যবান, সাদাসিধে জীবনের প্রতি মার প্রশংসা সুখী জীবনের পক্ষে দিশা স্বরূপ, বিশেষ করে বর্তমানকালে যখন নবীন প্রবীণ সবাই নানাভাবে ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠু করে তোলার জন্য অনেককিছু করার আছে। কাজেই আতিশয্যের অর্থহীন ক্ষেত্রে সময় নষ্ট করে নিজের বিষয়েই নিজে বন্দী হওয়া কেন?

সব যুগেই প্রগতির আদর্শে যেসব মহান ও উদ্যোগী কর্মী কাজ করেছেন তাঁরা সবাই শান্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করেছেন, এতে তাঁদের শরীর ভালো ছিল এবং সাধারণের মঙ্গলকর্মে তাঁরা সর্বদা সক্রিয় ছিলেন। যাঁরা অপ্রয়োজনীয় সম্পদের চূড়ায় বসে, ভৃত্য, কাপড়চোপড় ও আসবাবপত্রের বন্দী, এঁদের দৃষ্টান্তে তাঁরা লজ্জা পাবেন।

বিবর না করে ধ্বংসস্তূপ করা যায় না; এবং একজনের বিলাসের অর্থ বহুজনের দুঃখ। এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য সুন্দর মহান ও মহার্ঘ বহু কাজ করার রয়েছে, এইসব মানুষরা অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ও অর্থ নষ্ট করার মতো বুদ্ধিহীন নন।[3]

---

1. Tales of All Times (1964), পৃ: 89–90
2. ঐ, পৃ: 90
3. ঐ, পৃ: 40

শ্রীঅরবিন্দের নিষ্ক্রমণ

শ্রীমার জীবনে 1950 সালটি এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিকাল। ঐ বছরটি ছিল কণ্টকাকীর্ণ এবং তিনি নিজে নববর্ষের বাণীতে বলেন: 'কথা না বলে কাজ কর। বেশী সোচ্চার হয়ো না, অনুভব কর।' এটা বক্তৃতা, ভবিষ্যদ্বাণী বা অনুতাপের সময় নয়। বরং আত্মজ্ঞানের পথে সঠিক কাজ করার সময়। মার নিজের কোন সময় ছিল না, তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন; 1950-এ শ্রীঅরবিন্দকে তিনি বলেছিলেন: একটা মাত্র জায়গায় তিনি একা থাকতে পারতেন, সে জায়গাটা ছিল কলঘর।[1] কিন্তু মানুষের তামস শক্তির প্রকোপে তিনি ব্যথিত ছিলেন, এমনকি তাঁর তত্ত্বাবধানে ও উপস্থিতিতে ধ্যান করছেন এমন লোকদের মধ্যেও এই দোষ ছিল। তারপরই শ্রীঅরবিন্দের অসুস্থতা, এবং ক্রমশঃ শরীরের অবনতি। 24 নভেম্বরের দর্শন-দিবসটি মার কাছে উদ্বেগের বিষয় ছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্থৈর্য সহকারে মা ডিসেম্বর 1 এবং 2 তারিখে বিদ্যালয়-জন্মোৎসবের কাজ করতে থাকেন, কিন্তু জানতেন যে শ্রীঅরবিন্দ দৈহিক অস্তিত্বে নিস্পৃহ হয়ে পড়ছেন। 5 ডিসেম্বর সকাল 1-26 মিনিটে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেহ থেকে নিষ্ক্রমণপ্রাপ্ত হন, এমনকি মা তাঁর পদতলে দাঁড়িয়ে 'এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসহকারে দেখতে থাকেন শান্ত, সমাহিত এক ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাব।'[2]

সারা বিশ্ব মর্মান্তিক শোকে মূহ্যমান হয়, সাধকরা অত্যন্ত নিঃসহায় বোধ করেন। শ্রীমা দুঃসহ যাতনা চেপে বারংবার শ্রীঅরবিন্দের অচেতন দেহের সামনে এসে নীরবে তাঁর সাথে একাত্ম চিন্তা করছিলেন, তাঁর দেহ এক মাতৃবৎ মিষ্টতায় নম্রভাব ধারণ করে। কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়াই শ্রীঅরবিন্দের দেহ তিন দিন সজীব থাকে, সেজন্য সমাধিদানের কাজে দেরী হয়েছিল। এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের অলৌকিক মানসিক শক্তি মার মধ্যে এক পার্থিব অনুভূতি-প্রবাহ আনে। মাকে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার আহ্বান ছিল এতে, তবে এর পর থেকে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায়। মাতৃসুলভ উৎকণ্ঠা নিয়ে মা শোকাহত শিশুদের জন্য এক প্রার্থনা-বাণী দেন:

> প্রভু, আজ সকালে আপনি আমায় প্রতিশ্রুতি দেন যে আপনার লক্ষ্য অর্জন পর্যন্ত আপনি আমাদের সাথে থাকবেন, শুধু চেতনা-স্বরূপই নয় যা আমাদের

1. Champaklal Speaks, পৃ: 40
2. Twelve Years, পৃ: 270

> পথ দেখায় ও আলোক দান করে, কাজের ক্ষেত্রে গতিশীল সাহচর্যে আপনি আমাদের সাথে থাকবেন। সুনির্দিষ্টভাবেই আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আপনার সমগ্র সত্তা এখানে থাকবে এবং যতদিন না পৃথিবীর রূপান্তর হয় ততদিন আপনি এই পৃথিবীর পরিবেশ ত্যাগ করে চলে যাবেন না। কৃপা করুন যাতে আমরা আপনার উপস্থিতির যোগ্য হতে পারি এবং এর পর থেকে আমাদের সবকিছু আপনার পবিত্র কাজে নিবেদন করতে পারি।

9 ডিসেম্বরের সকালে দেহের পচনরক্ষাকারী অলৌকিক আভা আস্তে আস্তে চলে গেল। নলিনীকান্ত গুপ্ত ও অন্যান্য সাধকরা মার প্রতি প্রণাম নিবেদন করলেন। সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ আশ্রমের প্রার্থনাবৃক্ষতলে সমাহিত করা হোল। 1930 থেকে এই স্থানটিকে মা গড়ে তুলেছেন :

> শ্রীমা শোক দুঃখ সহ্য করার অসীম শক্তি নিয়ে উপরতলায় দালানের ওপরের এক জানলা থেকে দর্শন করলেন এই পবিত্র অনুষ্ঠান। তাঁর 35 বছরের আধ্যাত্মিক সাথী ও ঐশ্বরিক সহকর্মী দৃশ্যপট থেকে নিষ্ক্রমণের পথ বেছে নেওয়ার পর এখন কে মার এই ধরিত্রীসম দায়িত্ব বহন করবে? একা, একেবারে একা, দৃশ্যতঃ পবিত্র নির্জনতার মধ্যে পৃথিবীর রূপান্তর-মুহূর্তে একা 'যখন বিশ্বাত্মা, অর্থাৎ সত্যবান আসুরিক অশুভ শক্তির দাপটে নিষ্ক্রিয়, সম্ভাব্য আণবিক যুদ্ধের আতঙ্কে বিপর্যস্ত, 1950-এর ডিসেম্বরের এই পরিস্থিতিতে মার ভূমিকা কী হতে পারত ?[1]

আধ্যাত্মিক আকাঙ্খার বছরগুলি গড়িয়ে উৎসর্গের দশক থেকে রূপান্তরসাধনের যোগপর্বে উপনীত। আর এখন? সেই এক 'আত্মসম অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তি' যা অনেককিছু অর্জন করেছে, মা এখন অমরত্বের পথ ভাঙ্গার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন। শ্রীমার পার্থিব জীবনের চরম অধ্যায় মানবজাতির সামগ্রিক সিদ্ধি ও আশার দ্যোতক এক নবসৃষ্টির প্রয়াসে অতিবাহিত।

---

1. কে. আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, On the Mother

তৃতীয় অধ্যায়

সৃজন

দেখ,
স্বর্গকন্যা চলেছেন।
আনন্দের বার্তা নিয়ে সে মহীয়সী
দেবতাদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছেন,
তাঁর ঐ উজ্জ্বল উপস্থিতি
    দেবতাদের মধ্যে নিত্য বর্তমান।
হোমাগ্নিতে যারা আহুতি দেয়
সেই সব মানুষের জন্য
তিনি নিয়ে আসছেন দেবতাদের আশীর্বাদ ;
সৃষ্টির প্রথম দিনের মতো
    আবার আলো নিয়ে আসছেন
    চিরসুন্দরী এই দেবী।

ঋগ্বেদ

(শ্রীঅরবিন্দকৃত ইংরাজী থেকে অনূদিত)

তাঁর অনুপম মহত্ত্ব

দিন আসবে
যখন তিনি একাকী দাঁড়িয়ে থাকবেন
বিশ্ব বিপর্যয়ের শেষ কিনারায়।
তাঁর নিঃসঙ্গ হৃদয়ে সৃষ্টির ভবিষ্যৎ, আর
মানুষের আশা নিয়ে
সেদিন তাঁকে চেষ্টা করতেই হবে
জয় বা পরাজয়ের শেষ দুঃসাহসিক খেলায় অবতীর্ণ হতে ;
মৃত্যু আর ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
সেই শেষ দিনে তাঁর মহত্ত্ব হবে প্রকাশিত
মহাকালের সেতু অতিক্রম করে
তিনি পৌঁছবেন ভবিষ্যতের শিখরে।[1]

'সাবিত্রী' মহাকাব্য রচনার সময়ে শ্রীঅরবিন্দ এই শেষ কটি লাইন বলেছিলেন। কবিতাটি ভবিষ্যদ্বাণীর মতো শোনায় কারণ শ্রীমা এখন একা। অথচ এই সময়েই মার শান্ত স্থির ভাব এত উৎসাহজনক, মনে হয় শ্রীঅরবিন্দের নায়িকা মর্ত্যভূমে এসেছেন মহাজাগতিক নাটকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে :

অনন্ত করুণা বুকে নিয়ে
মানুষের অন্তরাত্মার জ্যোতি জাগাতে জাগাতে
তিনি ওপরে তাকিয়ে দেখছিলেন
নিঃশব্দ পর্বতশীর্ষের প্রাচীন দৃঢ় দুর্গের মতো
সেই শাশ্বতীকে ;
দিব্যদ্রষ্টার মতোই তিনি দেখেছিলেন।
সেই শাশ্বতী
যা তাঁর সর্ব কর্ম ও বিশ্বাসের উৎস,

---

1. *Savitri* পৃঃ 552

মহাবিশ্বে উৎসারিত সেই শক্তি
দুর্দম ইচ্ছার যা শান্ত স্রোতস্বিনী
নিত্য সত্যের সেই হিরণ্ময় প্রকাশকে
অচঞ্চলা শক্তির সেই জাগতিক রূপকে
তিনি দেখছিলেন—
এক সর্বগ্রাসী অস্তিত্বের মতো ।[1]

শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর পরিমণ্ডলে 'সক্রিয় কর্মধারায় গতিশীল উপস্থিতি'র প্রতীক হিসেবে ছিলেন। মা শ্রীঅরবিন্দের সমাধিক্ষেত্রে ধন্যবাদজ্ঞাপক এক বাণী রচনা করেন :

যিনি আমাদের প্রভুর জাগতিক আবরণ হিসেবে ছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনার কাছে, যিনি আমাদের জন্য এতকিছু করেছেন, কাজ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, দুঃখ বরণ করেছেন, আশান্বিত হয়েছেন, সহ্য করেছেন, আপনার কাছে আমাদের নিবেদন। যিনি সবকিছু আকাঙ্ক্ষা করেছেন, চেষ্টা করেছেন, প্রস্তুতি নিয়েছেন, আমাদের জন্য সবকিছু অর্জন করেছেন, আপনার কাছে নতজানু হয়ে নিবেদন করি, আমরা যেন এক মুহূর্তের জন্যও আপনার কাছে আমাদের ঋণ বিস্মৃত না হই।

কেউ ভাবতে পারেন যে আত্মসত্তাজ্ঞানসম্পন্না এবং লক্ষ মানুষের গুরুমা, যিনি আশ্রম গড়ে তুলতে এত করেছেন, তিনি হয়ত এবার বিশ্রাম নেবেন এবং এটা সহজভাবে নেবেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার পদ্ধতি অসাধারণ ছিল। বাস্তবে, তাঁর কাজ চারগুণ বেড়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ দিলীপ কুমার রায়কে একবার বলেছিলেন :

এটা এক নতুন আত্মজ্ঞান বা আলো বা আদর্শ হোক যা প্রথমে একজনের মধ্যে অবরোহণ করে তার থেকে বৃহত্তর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হবে। গীতাও ত একথাই বলেছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের কাজই সবার কাছে দৃষ্টান্ত হবে। সামগ্রিক যোগ-এ আত্মানুভবের পর কাজ শুরু হয়, অন্যান্য যোগ-এর ক্ষেত্রে সব শেষ হয় আত্মজ্ঞানে ।[2]

---

1. ঐ, পৃ: 646–47
2. *Among the Great*, পৃ: 225

শ্রীমা উজ্জ্বল আলোকজ্যোতির মতো আবির্ভূত হয়ে সাধকদের বললেন যে শোকাভিভূত হওয়ার অর্থ শ্রীঅরবিন্দ, যিনি চেতনায় ও সত্তায় আমাদের মাঝে রয়েছেন, তাঁকে অপমান করা। মা সবাইকে আরো কঠিন শ্রম দিয়ে নতুন আধ্যাত্মিক পৃথিবী গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন।

> শ্রীঅরবিন্দের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা তাঁর শিক্ষার জীবন্ত নিদর্শন হওয়া ছাড়া আর কী করতে পারি ?

বারোদিন পর মা আবার শিশুদের ক্লাশ নিতে শুরু করলেন এবং আশ্রমের খেলাধূলায় অংশ নিতে লাগলেন। দৃঢ়বদ্ধ পুনর্নিবেদনের নতুন প্রত্যয়ে জীবন চলতে লাগল। এই সময়ে আশ্রমশিশুদের শিক্ষায় মা সম্পূর্ণ ডুবে গেলেন। শিক্ষাকে কোনোদিন শুধু ব্যবহারিক উপযোগিতা হিসাবে তিনি দেখেন নি, যাঁরা এই দৃষ্টিতে শিক্ষার বিচার করতেন তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন :

> জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষা, প্রকৃতি ও জীবনের রহস্য জানার জন্য লেখা-পড়া করা, আত্মচেতনা বাড়াবার জন্য নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা, আত্মশিক্ষক হয়ে ওঠার জন্য সংযমী হওয়া, নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অজ্ঞতা দূর করতে, সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের, আরো সদাচারী ও সত্যের জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা...এঁরা এসব কিছু ভাবেন না, এসবই কাল্পনিক আদর্শ বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে সবচেয়ে জরুরী বিষয় হল বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া এবং কী করে অর্থ উপার্জন করা যায় তা শেখা।[1]

শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা 1952 সালে On Education-এ প্রকাশিত হয়। 'উদ্দেশ্যহীন জীবন সবচেয়ে দুঃখের হয়'—এই দিয়েই শুরু। আদর্শভিত্তিক জীবনযাপন করতে হলে মানসিক, আত্মিক, দৈহিক ও জীবনশক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক সামগ্রিক শিক্ষা নেওয়া দরকার। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা ভালো দৃষ্টান্তের ওপরই নির্ভর করে। শুধু নীতিবাক্য আউড়িয়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। পিতামাতাদের প্রতি শ্রীমার আবেদনে আন্তরিক আগ্রহের সুর ছিল :

> অভিভাবকবৃন্দ, আপনাদের মহান আদর্শ থাকা দরকার, এবং সেই আদর্শ অনুযায়ীই কাজ করা উচিত। আস্তে আস্তে দেখা যাবে ছেলেমেয়েরা সেই

---

1. *Bulletin*, আগস্ট 1960, পৃ: 145

আদর্শ গ্রহণ করছে এবং আপনার আকাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক গুণাবলী তাদের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে।[1]

সমগ্র জীবনের বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে যথার্থ শিক্ষা দিলে এক সামগ্রিক রূপান্তর সাধিত হয়ে কার্যকরী সৃষ্টির পথ সুগম হবে :

কারণ দৈহিক স্বাস্থ্যের মতো মানসিক স্বাস্থ্যের দিকও রয়েছে। দেহের মতো ইন্দ্রিয়েরও সৌন্দর্য ও ছন্দমাধুর্য রয়েছে। শিশু যখন সক্ষম হয় ও বুঝতে শেখে তখন শিক্ষার মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ ও সূক্ষ্ম চেতনা যোগ করে তার মনকে পরিশীলিত করে তুলতে হবে। প্রকৃতিতে অথবা মানবসৃষ্টিতে মহান, সুন্দর ও উচ্চতম আদর্শসমূহ তার সামনে তুলে ধরে তার মূল্যায়ন করতে শেখানো দরকার।[2]

মুখস্থ বিদ্যার ভিত্তিতে গড়েওঠা বর্তমান ভারতীয় শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমার কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মগজের ওপর অত্যধিক ভার চাপান, যা মস্তিষ্কের নমনীয়তা বাড়াবার পক্ষে ব্যায়াম-স্বরূপ হয়ে ওঠে, তাকে বাতিল করে মা শিশুর মনকে শিক্ষিত করে তুলতে পাঁচটি পর্যায়ের কথা তুলে ধরলেন :

1. মনের একাগ্রতা, মনোযোগ ক্ষমতার বিকাশ।
2. প্রসারতা, ব্যাপকতা, জটিলতা ও উৎকর্ষতার ক্ষমতা বাড়ানো।
3. কোনো মৌলিক আদর্শকে অথবা উচ্চতম আদর্শ বা সুস্পষ্ট ধারণা, যা জীবনের দিগ্‌দর্শন করতে পারে, তাকে ঘিরে সমগ্র ভাবনার সংহতি সাধন।
4. চিন্তার নিয়ন্ত্রণ, অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবনা ত্যাগ করা যাতে ব্যক্তি বোঝে যে সে কী চায় ও কখন তা চায়।
5. মানসিক স্থৈর্যের বিকাশ সাধন, সম্পূর্ণ শান্ত ভাব এবং সত্তার উচ্চ স্তর থেকে উদ্ভূত অনুপ্রেরণা আরো বেশি করে অনুভব করা।[3]

---

1. *On Education* (1952), পৃঃ 13
2. ঐ, পৃঃ 32
3. ঐ, পৃঃ 38

শিশুকে তার নিজের মনের মতো বই পড়তে দিতে হবে, তবে তার সাহায্যে সহায়ক পাঠক রাখার কথা মনে রাখা দরকার, কেননা : 'বুদ্ধিমত্তার সাথে বই নির্বাচন দিয়ে তার সুস্থ রুচি গড়ে তোলা যাবে, এতে সে ভালো, আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় বই পড়তে শিখবে।'[1] শিশুর মানসিক, দৈহিক ও চিত্তের সম্পূর্ণতা আনার উদ্দেশ্য হল যাতে এক নবজাতি, অতিমানবিক গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ গড়ে ওঠে :

> আকারগত সীমার বাইরে থেকে এক নবশক্তির, এক নবচেতনার অভ্যুদয় ঘটানো সম্ভব ; এই চেতনার বিকাশ এখনো হয়নি, তা উদ্ভূত হলে ঘটনা-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে পারে এবং এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে পারে।[2]

> মানবজাতির পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা রূপদানকারী উচ্চমার্গের চেতনার অবরোহণের জন্য মা অপেক্ষা করছিলেন, এই অবরোহণেই অতিমানসীয় শিক্ষার উন্মেষ ঘটবে। এতে আমরা শুধু মানবচরিত্রের ক্রমবিকাশ, এর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রকাশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হব তা নয়, এর মূল চরিত্র, সমগ্র সত্তার পরিবর্তন সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, মানবজাতির নতুনভাবে ঊর্ধ্বারোহণ এবং মানবসত্তা অতিক্রম করে অলৌকিক মানবসত্তায় এবং শেষে পৃথিবীতে ঐশ্বরীয় জাতির আবির্ভাব সম্পন্ন হবে।[3]

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র

1951-এর 24 এপ্রিল শ্রীমা আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিসম্মেলন আহ্বান করলেন। সারা ভারতের সুপরিচিত নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা পণ্ডিচেরীতে সমবেত হন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমা এক সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে বলেন :

> শ্রীঅরবিন্দ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, এবং সৃজনশীল প্রতিভার সব ক্ষমতা দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র স্থাপনে সভাপতিত্ব করছেন, অলৌকিক

1. ঐ, পৃঃ 41
2. ঐ, পৃঃ 60
3. ঐ, পৃঃ 62

> মানসের আলোকজ্যোতি দর্শনে ভবিষ্যতের মানুষকে প্রস্তুত করার জন্য এই কাজকে তিনি শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেছিলেন ; এই আলোই আজকের নেতাদের রূপান্তরিত করবে নতুন শক্তি, ক্ষমতা ও জীবনদানকারী এক নয়া জাতির প্রকাশ হিসেবে।[1]

একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়—মার সাথে কথায় শ্রীঅরবিন্দ নিজে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক প্রসার হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমে, শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভাবনায় বাইরের জগৎ বেশি উৎসাহ দেখান নি। অকুতোভয় মা সংস্থার অর্থের জন্য নিজের গয়না নীলামে বিক্রী করলেন। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয়-শাখাটির উদ্বোধন হয় 6 জানুয়ারী 1952 সালে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের ছাত্র কে. এম. মুন্সী। মা তাঁকে বলেছিলেন : আমি আস্তে আস্তে, পদে পদে কিন্তু দৃঢ়পদে গড়ে তুলছি এই বিশ্ববিদ্যালয়। পরে সুরেন্দ্র জওহরকে লেখার সময়ে মা বলেন : বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সময় লাগবে :

> হয়ত পঞ্চাশ, একশ বছর সময় নেবে, এবং ততদিন আমি থাকব কি না এ সন্দেহ আসতে পারে। আমি বেঁচে থাকতে পারি, না-ও পারি, কিন্তু আমার কাজ সুসম্পন্ন করতে এইসব শিশুরা তো থাকবে।[2]

এবং গীতার এই কর্মসন্ন্যাসযোগ আমাদের যুগেই বেঁচে ছিল! মার সম্বন্ধে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হয়ে কে. এম. মুন্সী লেখেন :

> সিল্ক পরিহিতা পঁচাত্তর বছর বয়স্কা টেনিস খেলায় অভ্যস্তা মহিলা, একটা ওড়না নিয়ে এবং আশ্রমবাসীদের মার্চ পাস্টে অভিবাদন গ্রহণ করছেন... স্বচ্ছ দৃষ্টি, চোখ কাঁচের মতো পরিষ্কার।[3]

মা তাঁকে পরিষ্কার বলেন যে 'ভারতকে আধ্যাত্মিক জগতের নেতৃত্ব বহাল রাখতে হবে। তা না করলে ভারত ধ্বংস হবে এবং তার সাথে সারা বিশ্বও একই পথে যাবে।' ভারত যে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক গুরু এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

---

1. উদ্ধৃত : *Sri Aurobindo : A Biography and a History*, পৃ: 1379
2. ঐ, পৃ: 1382–83
3. Mother India, জুন 1975, পৃ: 484

কিছুদিন পরেই তিনি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলেন: 'স্বকীয় আদর্শ নিয়ে ভারতকে উত্থিত হতেই হবে এবং বিশ্বের দরবারে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র (পরে, সেণ্টার অফ এডুকেশন) খুব দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। পাঠাগার, এবং নৃত্যের ঘর খোলা হয় 24 এপ্রিল 1952, এবং এখানে পাঠরত ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে শ্রীমা লেখেন: "যাঁরা আজকের এই মহান কাজে সহযোগী হয়েছেন, এই অসাধারণ কাজে অংশগ্রহণের জন্য পরে তাঁরা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করবেন।" এখানে অন্ধভাবে অতীতের সবকিছু ভেঙে বিপ্লব প্রতিষ্ঠার ব্যাপার নেই, চেতনার বৃহত্তর শক্তির উন্মেষ এবং মানুষের ক্ষমতার সীমা বাড়িয়ে নতুন কিছু গড়ার উদ্দেশ্য রয়েছে। কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের কথায়:

> শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবহারিক ভিত্তি এই বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত যে বর্তমানে যান্ত্রীকরণ দ্রুতগামী করে মানুষের বিযুক্তি ও মানবিক গুণাবলীর বিসর্জনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সব সুফল নষ্ট করে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সব সুপ্রভাব খর্ব করে আদিম অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মোকাবিলা করতে সব আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাভাবনা, মনের সবকিছু—আত্মা, তার প্রকৃত চেতনার উন্মেষ করে সমগ্র মানবতার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন, প্রকৃতি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে সম্পর্কস্থাপন... জ্ঞানের আকর মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তায়, কারণ চেতন আত্মা সবকিছু দেখে, মনে রাখে, বাদ বা যোগ দেয়, বাছাবাছি করে নেয়, ঐক্যবদ্ধ করে, রূপান্তরিত করে এবং তথ্য ও ঘটনাকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করে, জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় এবং প্রজ্ঞাকে যথার্থ আকাঙ্ক্ষা ও কাজের গতিশীল আধারে রূপান্তরিত করে। মানুষের ভিতরেই স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, যদিও তা অনেক সময়ে অহং-এর কারাগারে আটক থাকে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি, সহায়তা ও পথনির্দেশ দেওয়া, একটা মাধ্যম যোগানো, যা এই স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্জ্বলিত করবে এবং এর আলোয় চেতনা বিকশিত হবে, যে-চেতনা ব্যাপকতা ও প্রাখর্যে সমৃদ্ধ হবে।[1]

এর জন্য দরকার দৃঢ় সংকল্প, যুদ্ধে যোগদানকারী সৈন্যের মতো। উদ্বোধন দিবসে মা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের ছাত্রদের জন্য এক যথার্থ প্রার্থনা রচনা করে দেন:

---

1. Sri Aurobindo : A Biography and a History, পৃ: 1383-84

আমাদের বিজয়ী নায়ক হিসাবে গড়ে তুলুন, আমরা তাই হতে চাই। স্থায়ী হতে চলা অতীতের বিরুদ্ধে উদ্ভূতকামী ভবিষ্যতের সংগ্রামে আমরা যেন সফল হই ; নতুন ঘটনা যেন বিকশিত হতে পারে এবং আমরা যেন তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকি।

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের ওপর Bulletin-এ মা বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে বহু লোককে বিরাট আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসে, পরে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যেতে দেখেছিলেন। এই মোহভঙ্গ এড়িয়ে বিকাশ অটুট থাকতে পারে যদি ব্যক্তিকে, তার মনকে অগ্রণী রাখতে শেখানো যায়। শিশুকাল থেকেই চারটি সংযম - মনের, দেহের, আবেগ এবং জীবনীশক্তির সংযম গড়ে তোলা দরকার। আত্ম-সম্পূর্ণতার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি এবং লোকের সাথে বা পরিস্থিতির সাথে বিবাদের প্রবণতা ত্যাগ করা প্রয়োজন :

'অন্যের ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ কোর না, যতক্ষণ না তোমার আকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার পেতে তার চরিত্র সংশোধনের মতো ক্ষমতা তোমার থাকে ; এবং সে ক্ষমতা থাকলে অভিযোগ না করে তার চরিত্র সংশোধনে ব্রতী হও ৮ তুমি যাই কর, কখনো তোমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হোয়ো না। এই বিশাল উদ্ভাবনের কাজে কোন কিছুই ছোট বা বড় নয়। সবকিছুই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং তা এর সাফল্যকে ত্বরান্বিত বা দেরী করিয়ে দিতে পারে।[1]

মা এইভাবেই তাঁর কর্মসূচী চালু রাখলেন এবং নবজীবনের ক্রমবর্ধমান আশায় তা নির্দিষ্ট করলেন, এবং ক্রমাগত আশ্রমের শিশুদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ করলেন। সব সময়ের কথায়ই বিরল অভিজ্ঞতার সূচনা হোত :

একজন অনুভব করলেন যে তিনি শুধু ঘটনা বলে যাচ্ছেন তা নয় ; বিবরণের সব কথাই যেন তাঁর স্বকীয় সত্তায় জীবন্ত বা স্বকীয় চেতনা দ্বারা আমাদের মধ্যে তা প্রবাহিত করার প্রয়াস।[2]

এমন হয়েছিল বোধহয় তাঁর সবকটি গতিভঙ্গিতেই এক মহান ভাব ছিল তাঁর। কাছে সব জীবনই যোগ, সব জীবনই ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গীকৃত। Huta-কে তিনি একবার লেখেন :

---

1. A Scheme of Education (1952), পৃ: 104
2. Mother India, জুন 1975, পৃ: 484

> আমি কখনো ধ্যানে বসি না, তার সময় নেই এবং প্রয়োজনীয়তাও নেই। কারণ ধ্যানের মাধ্যমে কেউ ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হতে পারেন না। আত্মনিবেদন ও উৎসর্গের মাধ্যমে—এবং এই নিবেদন ও উৎসর্গকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।[1]

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের কাজে 'যোগ' ছিল এক আবেষ্টনকারী দিগন্তস্বরূপ। 1953-এর ফেব্রুয়ারীতে 'ক্রমবিকাশ'-এর ওপর একটি প্রদর্শনী হয়, তাতে আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের আঁকা ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। ঐ বছরেই নভেম্বর মাসে 'যোগ-এ বিভিন্ন ফুলের তালিকা' সন্নিবিষ্ট করার প্রদর্শনী হয়। মা নিজে ভাল চিত্রশিল্পী ছিলেন, এবং জাপানের ইকেবানা বা ফুল সাজাবার শিল্প রপ্ত করেছিলেন। আশ্রমের শিক্ষা-আদর্শ, শিল্প ও খেলাধুলা সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়ে বহু বহিরাগত দর্শক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র দেখতে আসতেন। জওহরলাল নেহেরু এই কেন্দ্র দেখে দারুণ খুশী হন। ভারতের সর্বত্র স্কুলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁর দুঃখ ছিল। একবার পরিদর্শনের পর শিক্ষাবিদ বি. সঞ্জীব রাও লেখেন :

> আধুনিক যুগে সিনেমা, বিজ্ঞাপন এবং সাময়িক পত্রিকার ছবিগুলির জন্য যৌনতা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—সব ধরণের সৃজনশীল কর্মের অবদমনের ফলে যৌনতাই একাকীত্ব ও বিরক্তি থেকে নিষ্কৃতির মাধ্যম হয়েছে। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট করে মা প্রাথমিক যৌবন-কালের সমস্যা এড়াতে পেরেছেন। দৈহিক সক্ষমতা বজায়ের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়—খেলাধুলা, দৈহিক ব্যায়াম, সাঁতার, ড্রিল এবং অন্যান্য ব্যায়াম দিয়ে দৈহিক স্তরে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। যথেষ্ট বুদ্ধিগত খোরাক দিয়ে মন পুষ্ট করা—এবং আধ্যাত্মিক স্তরে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার অনুপ্রেরণা এক অবিচ্ছিন্ন উদ্দীপক শক্তি হিসাবে কাজ করে।[2]

---

1. White Roses (1973), পৃ: 176
2. উদ্ধৃত : *Life in Sri Aurobindo Ashram*, পৃ: 191–92

এর মধ্যে 1954-র পয়লা নভেম্বর পণ্ডিচেরী ভারতের সাথে যুক্ত হয় এবং শ্রীমা ভারতের নাগরিকত্ব নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি এক বাণী দেন যা মানবিক ঐক্যের যথার্থ বাণী :

> জন্মসূত্রে ও শিক্ষায় আমি ফরাসী, পূর্বানুরাগ ও পছন্দ অনুযায়ী ভারতীয়। আমার চেতনায় এই দুইয়ে কোনো বিরোধ নেই, বরং এরা বেশ ঐক্যবদ্ধ ও পরস্পর সম্পূরক। আমি জানি যে উভয়ের কাজেই আমি লাগব, কারণ আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের মহান শিক্ষার রূপায়ণ এবং তাঁর শিক্ষায় তিনি বরাবর বলেছেন সব জাতিই প্রকৃতিগতভাবে এক এবং এক সংগঠিত সুসামঞ্জস্য-ঐক্যের মাধ্যমে পৃথিবীতে ঈশ্বরের ঐক্যতান প্রকাশ করাই তাঁর লক্ষ্য।

শ্রীমার স্বপ্ন ডানা মেলতে শুরু করল, এবং স্বকীয় চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি আগামীদিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই স্বপ্নই পরিণতিতে আদর্শ নগরীর রূপ পেল যেখানে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নের মানব-ঐক্য ও বিশ্ব-ঐক্যতানের আদর্শ আদরণীয় হয়ে থাকবে :

> আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক বড় পরিবার সৃষ্টি করা যেখানে সবাই ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে...2000 লোক থাকতে পারে এমন এক নগরী পত্তনের কল্পনা আছে। আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তা নির্মাণ করা হবে, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে...এই আদর্শ স্থানে প্রবেশাধিকারের অন্যতম শর্ত হবে সৎচরিত্র, ভাল ব্যবহার, সততা, নিয়মিত ও সুযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং সাধারণ সদিচ্ছা।[1]

পরবর্তী এক বাণীতে তাঁর এই সুন্দর স্বপ্নের বিশদ বিবরণ আছে :

> পৃথিবীতে এমন এক জায়গা থাকা দরকার কোন জাতিই যেটাকে নিজেদের সম্পত্তি হিসাবে দাবি করতে পারবে না, সবাই যেখানে বিশ্বের নাগরিক হিসাবে বাস করতে পারবে, পরম সত্যের একমাত্র কর্তৃত্ব মেনে চলবে, শান্তি, ঐক্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মানুষের সব সংঘাতময় সহজাত বোধসমূহ নির্মূল

1. উদ্ধৃত : Sri Aurobindo : *A Biography and A History*, পৃঃ 1399.

হয়ে সবার দুঃখ-যাতনা দূর করায় নিয়োজিত হবে, মানুষের দুর্বলতা ও অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যাবে ; যেখানে ব্যবহারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কামনাবাসনার চেয়ে মনের চাহিদা ও প্রগতির প্রশ্ন অগ্রাধিকার পাবে।

পণ্ডিচেরীর আশ্রম এই পথের শুরু মাত্র এবং এর থেকেই প্রভাতসম আলোক-নগরীর দিকে যাওয়া যাবে।

'মহান রহস্য'

বিশ্ব-ঐক্য এবং মানবতার ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে স্বকীয় চিন্তার রূপ দিতে শ্রীমা দুটি ছোট নাটক রচনা করেন, *The Great Secret* এবং *The Ascent of Truth*. *The Great Secret*-এর উপ-নামকরণ হয় : *Six Monologues and a Conclusion*. লেখার ব্যাপারে নলিনী, পবিত্র, আঁদ্রে ও প্রণব সহযোগী ছিলেন। ছ'জন বিখ্যাত লোক ও একজন অখ্যাত যুবক মধ্য-সাগরে পড়ে একটা লাইফবোটে আশ্রয় নেন। বিখ্যাত লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন রাষ্ট্রনেতা, একজন লেখক, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন শিল্পপতি ও একজন দৌড়বীর। বয়স, চালচলন বা পেশা দিয়ে অজ্ঞাত লোকটির পরিচয় বোঝার অবকাশ ছিল না। হালের কাছে বসে তিনি চুপ করে সবার কথা শুনছিলেন। পরিস্থিতি অসহায় ছিল কারণ খাবার জল ফুরিয়ে গিয়েছিল, উদ্ধার পাবার কোনো আশাও ছিল না। বর্তমানের অসহায় অবস্থা ও আশু মৃত্যুর চিন্তা থেকে মন সরাবার জন্য সবাই নিজেদের জীবন-বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন। রাষ্ট্রনেতা শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু হত্যাকারী যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। লেখক আদর্শ নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষে সবই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের সাধনায় ব্রতী হন কিন্তু শেষে অনুভব করেন : 'বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নৈতিক উন্নতি হবে এমন কথা নেই।' এবং শিল্পী কী লাভ করলেন ? তাঁর সৃষ্টিচিন্তা পুরনো আঙ্গিকে ঠিকভাবে প্রকাশ পেল না। সুতরাং তিনিও ব্যর্থ হলেন। শিল্পপতির ব্যাপার হল, ব্যবসায়ে বহু সাফল্য সত্ত্বেও তিনি সুখের রহস্য দেখতে পেলেন না।

এমনকি দৌড়বীরও ব্যর্থতাবোধে আক্রান্ত। কারণ দেহের সুগঠন দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর ধাঁধা বুঝতে অক্ষম। সবশেষে অজ্ঞাত যুবকটির পালা, সে শান্ত, পরিষ্কার ভাবে বলল :

> আপনারা মানবতার উচ্চতম শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন, আপনারা সবাই মানুষের লব্ধ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, মানবজাতির উচ্চতম শীর্ষে আপনারা আছেন। কিন্তু এই শীর্ষচূড়ায় বসে আপনারা এক রসাতলের সম্মুখীন এবং আপনারা আর এগোতে পারছেন না।

কৃতিত্ব ও খ্যাতির মুহূর্তে অপ্রবৃত্তি গ্রাস করে সবাইকে, কেননা মানুষ জীবন মৃত্যুর রহস্যের কিনারা করতে পারেনি। কিন্তু 'আত্মিক' না হয়ে উঠলে মানুষ এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না : 'তার জন্য নতুন ও উচ্চতর চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে মানুষের মধ্যে, এই চেতনা হচ্ছে সৎ-চিৎ-এর চেতনা।' আপাতদৃশ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস্তব সত্য অনুভব করতে হবে মানুষকে. সত্যের বাস্তবতাই সেই বস্তু :

> এবং সেই বাস্তবতা রয়েছে, খুব কাছেই, তোমার সত্তার কেন্দ্রস্থলে এবং বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেও। তোমাকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে এবং তার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। এবং তখনি তুমি সব সমস্যার সুরাহা করতে পারবে, সব অসুবিধা অতিক্রম করতে পারবে।

যুবকটি সচেতন যে ছ'জনই বলবেন যে এটা ত ধর্মের কথা। তা নয়। বিশ্বের ধর্মগুলি যে মীমাংসা দেয় তার ভিত্তি হচ্ছে মৃত্যু, জীবন নয়। ইহজীবনের ভিত্তিতেই ধর্ম তার মীমাংসা দেয়। এই জীবন থেকেই মহত্তর জীবন গড়ে তুলতে হবে এবং আনন্দ-এর ডানায় ভর করে মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ধারণ করতে হবে :

> কারণ প্রকৃতি এক অবস্থা থেকে আর এক উচ্চতর অবস্থায় বিবর্তিত হয়, এক জাতির পর আর এক জাতির উদ্ভব হয় যারা বিশ্বচেতনার বিকাশে সক্ষম। সবাই প্রমাণ করতে চায় যে মানুষই পার্থিব বিবর্তনের শেষ স্তর নয়। মানবজাতির পরে এমন এক নতুন প্রজাতি আসবে যারা মানবের তুলনায় এমন উন্নত হবে যেমন জন্তুর তুলনায় মানুষ উন্নত ছিল। বর্তমানের মানুষ-চেতনার স্থানে এক নব চেতনার উদ্ভব হবে, এই চেতনা মানসিক নয়,

> অতিমানসিক হবে। এবং এই চেতনাই এক মহত্তর অলৌকিক চেতনা বা দৈব জাতির জন্ম দেবে।

ছয়জনকে এই মর্মে আশ্বাস দিল যে বিশ্বাসই অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে এবং এই সম্ভাবনা বাস্তব করে তুলতে পারে। এরপর সে বলল :

> আসুন, আমরা আন্তরিকভাবে এই নবচেতনার অবরোহণ আহ্বান করি, এই নবশক্তি, নব সৌন্দর্য, নতুন সত্য নিশ্চিতভাবেই বিকশিত হবে যাতে পৃথিবী রূপান্তরিত হয়, উচ্চ স্তরের মানসিক চেতনা পার্থিব জগতে মূর্ত হতে পারে।

এবং প্রার্থনার মুহূর্তেই দূরে একটা জাহাজ দেখা গেল এবং তাঁদের উদ্ধার করতে এল।

Ascent of Truth নাটক মার অঙ্কিত Hall of Aspiration চিত্র অনুসরণে লেখা। কয়েকজন ভদ্রলোক (একজন মানবপ্রেমিক, একজন নিন্দুক, ছাত্ররা) শিল্পীর স্টুডিও-তে জমায়েত হয়েছেন। পাহাড়ে উঠে তাঁরা সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। ভ্রমণের এই মৌলিক ভাবনা, অন্বেষণ বা আরোহণের প্রবৃত্তি অতিকাহিনীতে পুণ্য পাত্রের অন্বেষণ হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কবিতায় এমন এক ঘটনা রয়েছে যেখানে এক বিশ্বাস-নিষ্ঠ মানুষ তীর্থযাত্রায় যান। এই যাত্রায় ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয় এবং রাতের অন্ধকারে তীর্থযাত্রীরা বিশ্বাস-নিষ্ঠ মানুষকে ভূয়া নেতা ভেবে হত্যা করে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিষয়টি আরো দূরে নিয়ে গেছেন, মৃত নেতার প্রেতাত্মার পরিচালনায় তীর্থযাত্রীরা চলতে থাকে। অবশেষে সকালে একটা কুটীরে আসে। তাদের কাছে শিশুটি আবির্ভূত হয়, সে-ই আগামী দিনের নেতা।

মার নাটকেও যাত্রার প্রথম পর্বটি একই রকমের—বিরক্তিকর। প্রথমকার উৎসাহ নিভে যায় এবং বেশিরভাগ পর্বতারোহণকারীই কষ্টকর অন্বেষণ হতে নিবৃত্ত হন। এমনকি যোগী পুরুষটিও প্রায় শেষ অবধি উঠে নিবৃত্ত হন ও একটি কুটিরে বিশ্রাম করতে চান। শুধু দুজন ছিলেন ; আকাঙ্ক্ষীরা শীর্ষের কাছাকাছি এসে দৈব কৃপার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন। অদৃশ্য ডানায় ভর করে তাঁরা এক সুন্দর আলোসহ শীর্ষে উঠলেন, দেখতে পেলেন সেইসব 'নিখুঁত আকার, সেই অত্যাশ্চর্য ঐক্যতান, প্রতিশ্রুতির ভূমি, নতুন পৃথিবী।'

‘উচ্চাভিলাষিণী মা’

1955 সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আশ্রম ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে দুবার আসেন। সেখানে ব্যবহারিক বুদ্ধি, শৈল্পিক বোধ, এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত দেখে তিনি মোহিত হন। খেলার মাঠে আবৃত্তি, জিমনাসটিকস ও দৌড়ের প্রদর্শনের প্রশংসা করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঐ বছরেই আসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ছাত্রগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হন। আরো বহু অতিথিও আসেন : আর. আর. দিবাকর, শ্রীপ্রকাশ, ডঃ করণ সিং, আচার্য বিনোবা, সোভিয়েট জিমনাসটদের একটি দল, আরো অনেকে। যিনি এসেছেন, সব দেখে প্রভাবিত হয়েছেন এবং আশান্বিত হয়ে ফিরেছেন। সি. ডি, দেশমুখ যেমন বলেছেন :

> পণ্ডিচেরীর যোগ-আশ্রম সত্যিকারের এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরীক্ষাশালা। এটা শ্রীঅরবিন্দের যোগের এক গতিশীল পর্ব। সব সাধক শ্রীমার সাথে একাত্ম, মার উপস্থিতিতে সবাই ধ্যান করেন। আশ্রমটি যেন প্রতিশ্রুত ভূমির সদৃশ এক চিত্রকল্প।[1]

আশ্রম ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র তাদের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নৈপুণ্যের জন্য বিরাট প্রচার পাচ্ছিল, কিন্তু তাতে মা সন্তুষ্ট ছিলেন না। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা নিজে উচ্চতর চেতনার অবরোহণ করিয়ে পৃথিবীকে আধ্যাত্মিকতাময় করে তুলতে প্রচণ্ড চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মানবতার পক্ষ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। পৃথিবী এখনো মানবিক বিচারের উচ্চাকাঙ্খা ও অর্জন কামনায় পূর্ণ। আশ্রমের শিক্ষায়ও তা প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছিল। ‘তামসিকতার প্রহসনপূর্ণ নিবেদন, মার ঘাড়ে সব তামসিক দায়িত্ব চাপানোর’ সমস্যাও ছিল। ক’বছর আগে মাকে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন :

> দৈবশক্তি তোমাদের সবকিছু করে দেবে এই ভুল ধারণা ত্যাগ কর...এমনকি তোমার হয়ে নিবেদনও করে দেবে এমন ধারণা ভুল...তোমার নিবেদন আত্মকৃত ও স্বেচ্ছাকৃত হওয়া চাই ; এটা যেন জীবন্ত সত্তার নিবেদন হয়, যান্ত্রিক কোন মাধ্যম বা নিষ্ক্রিয় যন্ত্রের নিবেদন যেন না হয়।

1. Champaklal Speaks, পৃঃ 131

কিন্তু আশ্রমবাসীদের মধ্যেও প্রকৃত আত্মনিবেদনের ভাবের অভাব রয়েছে এটা মা বুঝলেন ; নতুন জীবনের জন্য তীব্র ঐকান্তিক আগ্রহও তেমন নেই দেখা গেল। লোকে পরিচিত খাতের চারধারেই পাক খেতে লাগল যদিও তারা বহু ত্যাগ করেছে এবং নিখুঁত কাজ করতে চেষ্টা করেছে। লোকের কাছ থেকে কী তিনি বেশি আশা করেছেন :

> আমার সম্বন্ধে বলা হবে : 'তিনি উচ্চাকাঙ্খিনী ছিলেন, বিশ্বকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।' কিন্তু দীর্ঘ ও মন্থর প্রক্রিয়া ছাড়া বিশ্ব আপনা আপনি রূপান্তরিত হয় না......
> আমি দেখছি যে প্রকৃতি দেরী করে এবং নষ্ট করে। কিন্তু সে দেখছে যে আমি অত্যন্ত অস্থির এবং বড্ড বেশি দাবি করি।—পীড়াদায়ক।

মা নিশ্চিতভাবেই উচ্চাকাঙ্খিনী ছিলেন। কিন্তু নিদারুণ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি নিরুৎসাহ হননি এবং কখনো সংগ্রাম থেকে সরে যান নি। শিষ্যদের আরো উচ্চস্তরে তোলার জন্য তিনি ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন। প্রথম জীবনে লেখা তাঁর দীর্ঘ রচনা 'The Supreme Discovery' এব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল স্বরূপ। প্রথমে বয়স সম্বন্ধে তিনি একটি বাস্তব উপদেশ দিচ্ছেন :

> ব্যক্তি-আমি ও বিশ্বজনীন-আমি এক ; প্রতি শব্দে, প্রতি জিনিসে, প্রতিটি পরমাণুতে ঈশ্বর রয়েছেন, মানুষের কাজই হচ্ছে এর প্রকাশ ঘটানো। সেজন্য নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন হতে হবে। এই অবস্থায় পৌঁছতে কাউকে কাউকে প্রকৃত শিক্ষানবীশীর মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাদের অহং সত্তা বড় বেশী আগ্রাসী, আবদ্ধ, সংরক্ষণশীল এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই দীর্ঘস্থায়ী ও যাতনাময়। বিপরীত দিকে, অন্যেরা বেশী নৈর্ব্যক্তিক, বেশি সমর্থ, বেশী আধ্যাত্মিক, তারা সহজেই স্বকীয় সত্তার আধ্যাত্মিক উৎসের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে এতেও তারা রোজ নিরবচ্ছিন্নভাবে যেন সামঞ্জস্য সাধন ও রূপান্তর সাধনের সংগঠিত প্রয়াস করে যাতে তাদের এই পবিত্র আলোর ছটা যেন কোন কিছুর দ্বারা ঢেকে না যায়।[1]

1. The Supreme Discovery (1964)

এবং অনুগ্রহের উত্তর সম্বন্ধে কী হবে? মা যখন ঈশ্বরের কৃপার সেবার কথা বলেন তখন মন্ত্রের তরঙ্গ সমুদ্রে আরোহণ করে বলেন :

মধ্যেকার ঐশ্বরীয় সত্তা কখনো চেপে বসেন না, কোনো দাবি করেন না, ক্ষতি করেন না ; তিনি নিজেকে দান করেন, সম্পূর্ণ নিবেদিত হন. সবকিছু ও সব সত্তার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন. নিজের উপস্থিতি ভুলে যান ; কাউকে দোষ দেন না, কারো বিচার করেন না, অভিশাপ বা নিন্দাও করেন না, কিন্তু সর্বদা কাজ করে যান নির্বিঘ্নে সবকিছুকে নিখুঁত করতে, কোনো বিনা ভৎর্সনায় সংশোধন করেন, অধৈর্য না হয়ে উৎসাহ দেন, সবাইকে স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেন ; তিনিই মা, যাঁর ভালোবাসা ধারণ করে ও পুষ্ট করে, সুরক্ষিত করে এবং সতর্ক করে, পরামর্শ ও সান্ত্বনা দেয় ; কারণ তিনি সবাইকে বোঝেন, সবাইকে সমর্থন করেন, ক্ষমা করেন সবাইকে, সবার জন্য আশা করেন ও প্রস্তুত করেন সবাইকে। সবাইকে নিজের মধ্যে ধারণ করে তাঁর এমন কিছু থাকে না যা সবার নয়। কারণ তিনিই সবার শাসনকর্তা এবং সবার ভৃত্য : এবং সেজন্যই ছোট বড় সবাই, যাঁরা তাঁর সাথে রাজা হতে চান বা তাঁর মধ্যে ঈশ্বর হতে চান, সবাই তাঁর মতোই ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে শাসনকর্তা না হয়ে সেবক হন।[1]

বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও মা অতিমানবিক শক্তি নিয়ে নর-নারীর যুবক-যুবতীর সমতা স্থাপনের চেষ্টা করে গেছেন, এবং হতাশা ও অসহায়তাবোধ থেকে তাদের উঠে আসতে সাহায্য করেছেন :

ঐশ্বরিক আলোক ও জীবনের সংস্পর্শে যতবেশী আসা যাবে ততই পার্থিব জীবনের মিথ্যা অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেদনাবোধ করা যাবে।
কিন্তু এই বোধকে রূপান্তর সাধনের উদ্দীপক হিসাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে আমরা এই মিথ্যা অস্তিত্ব থেকে সত্যের মহিমায় উপনীত হতে পারি।[2]

এবং Huta-কে তিনি লিখলেন :

---

1. ঐ
2. White Roses (1973), পৃ: 53

> তুমি জিজ্ঞাসা করেছ আমি কখন প্রার্থনা করি, অর্থাৎ তুমি যাতে প্রার্থনায় যোগ দিতে পার। কিন্তু শোন, প্রার্থনার বা ধ্যানের কোনো বিশেষ সময় নেই আমার—এই দেহ দিন রাত অবিচ্ছিন্নভাবে চালু আছে, এমনকি যখন অন্য কাজে তা ব্যস্ত থাকে, তখনো। পরম প্রভুকে ডাকার সময়ে, এই মায়াময় পৃথিবীতে পরম সত্যের প্রকাশ ঘটাবার জন্য অথবা এই অসঙ্গতিময় পৃথিবীতে তাঁর পরম প্রেম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রার্থনার সময়েও দেহ একইভাবে বেঁচে চলে। কাজেই যে কোনো সময়ে ইচ্ছা হলেই প্রার্থনা করতে পার, এবং নিশ্চিতভাবে তোমার প্রার্থনা আমার প্রার্থনার সাথে যুক্ত হবে।[1]

দূরদৃষ্টির অভাবের দরুণ লোকে হতাশ হয়ে যায় কারণ অলৌকিক মানসের অবরোহণে অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটে না, এতেই বোঝা যায় তাদের অজ্ঞতা কত গভীর!

> এটা বাস্তবিকই ভাবা যুক্তিযুক্ত যে আত্মার প্রকৃতিরূপ বুঝতে হলে আত্মা সম্বন্ধে চেতনাসম্পন্ন হতে হবে। আত্মা সম্বন্ধেই সচেতন না হলে তার কাজের রূপ বুঝবে কীভাবে? কেননা আত্মা বা মন যা কাজ করে তার ফল ব্যবহারিক জগতে পাওয়া যায়, এবং ব্যবহারিক হওয়ার জন্য তুমি মনে কর এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতি কী করছে এবং আত্মা কী করছে না করছে সে সম্বন্ধে কতটুকু জান?[2]

অতিমানবিকতার অবরোহণ

1950-এর দশকে শ্রীমা সন্ধ্যার প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চালু রেখেছিলেন এবং শিশুদের কৌতূহল ও সন্দেহ নিবৃত্তি করতে সাহায্য করতেন। অনিবার্যভাবে তিনি আত্মার স্বরূপের দিশা দিতেন যা চন্দ্র তারকা সহ অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে।

1956-এর ফেব্রুয়ারীতে শ্রীমার তৈরী করা পাখা ও জরির কাজের প্রদর্শনী হয়। এর পর 21 ফেব্রুয়ারীতে 'দর্শন' অনুষ্ঠিত হয়। 29শে সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় ধ্যান

---

1. ঐ, পৃ: 63–64
2. Questions and Answers (1956), পৃ: 10

করার সময়ে মা অতিমানসের অবরোহণ-এর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মার উদ্ধৃতিতেই বলা যাক :

> এই সন্ধ্যায় ঐশ্বরিক উপস্থিতি, বাস্তব ও মূর্ত অবস্থায়, তোমাদের মধ্যেও বিরাজ করছেন। বিশ্বের আকৃতির চেয়েও বড় এক জীবন্ত স্বর্ণপিণ্ডের আকার ধারণ করেছিলাম এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও ঈশ্বরের মধ্যে বিচ্ছিন্নকারী এক স্বর্ণদ্বারের সামনে আমি।
>
> সেই দরজার দিকে তাকালাম যখন, আমি জানতাম ও সেই ইচ্ছাই করেছিলাম, চেতনার একটিমাত্র গতিতে বুঝলাম 'সময় হয়েছে' এবং দু'হাতে একটি সোনার হাতুড়ি তুলে ধাক্কা দিলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজাটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।
>
> তারপর অতিমানবিক আলো এবং শক্তি ও চেতনা অবিশ্রান্ত ধারায় পৃথিবীতে প্রবাহিত হতে শুরু করল।

এর অর্থ হচ্ছে অতিমানবিক আলো পৃথিবীতে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু বাহিরের বাস্তব জগতে কী এতে কোন পরিবর্তন এসেছে? মার উত্তর, অতিমানবিক জাতির উদ্ভব হতে হয়ত বহু শতাব্দী লাগবে, কিন্তু এর মধ্যবর্তী কোন প্রজাতির দৃষ্টান্ত এখনই পাওয়া যেতে পারে :

> ......সময় এসেছে যখন মানবতার উচ্চ স্তরের লোকেরা আধ্যাত্মিকরণের শর্ত পূরণ করছেন, তাঁরা অতিমানবিক শক্তির সাহায্যে তাঁদের চেতনা, জ্ঞান ও দেহ রূপান্তরিত করে জান্তব মানুষ না থেকে অতিমানবের রূপ নেবেন।[1]

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, দিল্লী শাখায় বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী বাণী দেবার সময়ে মার মনে একথা ছিল :

> পৃথিবীতে এক নতুন আলোর দিশা পাওয়া গেছে।
>
> আজকের নব প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় এই আলোয় পরিচালিত হোক।

1957 সালের ফেব্রুয়ারীতে ৪৪ বৎসর পূর্তিতে মার বাঁ চোখে হেমারেজ হয়, পরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। কিন্তু কিছুতেই তিনি কঠোর পরিশ্রম থেকে বিরত হন না।

---

1. Questions and Answers (1956), পৃঃ 10

আশ্রমের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রশাসনিক কাজ ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা করতেন এবং আশ্রমবাসীদের স্বপ্ন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের সাথে আলাপ করতেন। ধ্যানের পর ধম্মপদ-এর পংক্তি থেকে ব্যাখ্যা করতেন এবং এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতেন।

প্রায়ই তাঁর মন্তব্যে অরবিন্দীয় যোগের দৃষ্টিতে বৌদ্ধ দর্শনের সারবস্তু পাওয়া যেত এবং তিনি স্বকীয় চিন্তার মাধুর্যে বক্তব্য তুলে ধরতেন :

> মৃত্যু থেকে কিছু আশা কোর না। জীবনই মুক্তির পাথেয়। জীবনের মধ্য থেকেই নিজেকে রূপান্তরিত করতে হবে। পৃথিবীর অস্তিত্বেই তুমি অগ্রগতি কর এবং পৃথিবীতেই অনুভব কর। দেহে থেকেই তোমায় জয়কে করায়ত্ত করতে হবে।

গীতায় মার আস্থা এবং ধম্মপদে প্রীতি, স্বকীয় যোগের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে এই ঐক্যবদ্ধ ধারণা রূপ পায় :

> ঈশ্বরের কৃপায় অশেষ বিশ্বাস রয়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদন, তাঁর পরিকল্পনায় একাগ্রভাবে বিশ্বাসী হলে সবকিছু কাজ বিনা লাভের আশায় হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। সব দুঃখের অবসান। চেতনা এক অপরিবর্তনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয় এবং সব পদক্ষেপ গ্রহণেই অলৌকিকত্বের উজ্জ্বল রূপ দৃষ্ট হয়।

নতুন দিশা

আশি বছর বয়সেও মা প্রদর্শনী দেখতেন, আশ্রমের শিশুদের শিল্পকর্মের প্রশংসা করতেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে যেতেন, যেসব জায়গায় সংশোধনের দরকার সেখানে উপস্থিত হতেন। বারান্দা থেকে প্রাত্যহিক 'দর্শন' দিতেন, খেলার মাঠে বক্তব্য রাখতেন, সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সাথে কথা বলতেন, চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন, অর্গান বাজাতেন। স্বকীয় ব্যক্তিত্ব সীমিত রেখে এইসব সাধারণ জীবনযাত্রার

পরিধির মধ্যে তিনি থাকতেন, যদিও অতিমানসিক জগতের শক্তি, গৌরব ও আনন্দ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন :

> যেকোনো বোকা লোকেরও বেশি ক্ষমতা থাকে যদি সে প্রয়োজনীয় কৌশল অর্জনের উপায় জানে ; সেক্ষেত্রে অতিমানসিক জগতে যে যত বেশি চেতনাসম্পন্ন ও সত্যনিষ্ঠ, বস্তুর ওপর তার ইচ্ছার তত বেশি কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে। সেই শক্তিই প্রকৃত শক্তি...শক্তিহীনতা অতিক্রম করার কোন উপায় নেই। এক্ষেত্রে লাখে একটাও ঘটনা নেই যেখানে কর্তৃত্ব কোন সত্যের প্রকাশ রূপে দেখা দেয়। সবকিছুই অর্থহীন।[1]

কিন্তু তিনি সব কাজ ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে করতে লাগলেন। পুষ্প-সম্ভার, নৃত্য, আবৃত্তি সহকারে মার আশিতম জন্মদিবস উদযাপিত হল, মার উপস্থিতিতে পনের মিনিট ধ্যানও হল। ভারতবর্ষের অন্যান্য শাখা-আশ্রমে ও বিদেশে একই ভাবে জন্মদিবস উদযাপিত হয়।

1958 সালের 9 নভেম্বর মৃদু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মা অসুস্থ হন এবং শয্যা-শায়িনী থাকেন। শ্রীমার ব্যক্তিগত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়িকা বসুধা নামে জনৈকা সাধিকা মার সব প্রয়োজন দেখাশোনা করেন। 1960-এর 29 ফেব্রুয়ারী, অতি-মানসিক অবরোহণের চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মা দর্শন দেন। তিনি তিরিশ মিনিট ধরে অর্গানে প্রাণময় সুর তোলেন এবং 'তাঁর সুরমাধুর্যে যেন উপরের অদৃশ্য জগৎ হতে স্বর্ণশিশির ঝরে পড়ছিল।' পরে ধ্যানের হলে হলুদ শাড়ী পরে বসেছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের পদ্ম-অঙ্কিত প্রায় 2500 সোনার পদক বিতরণ করেন। সর্বত্র খুশী ও আনন্দের ঢেউ, দর্শকরা পুলকিত। বেদজ্ঞ পণ্ডিত এস. ডি. শাঠওয়ালেকার কিছুদিন আশ্রমে থেকে ও শ্রীমার সাথে কথা বলে যে ভাব প্রকাশ করেন :

> এখানে কোথাও জাতিভেদ দেখছি না। মা এখানে কী যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন !......আজ বুঝছি, মা স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর জোর দেন, মিতব্যয়িতায় নয়। পৃথিবীকে একই অবস্থায় রেখে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করতে চান না, আধ্যাত্মিকতায় পরিচালিত করে পৃথিবীকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে চান।[2]

---

1. Questions and Answers (1956) পৃ: 243–44
2. Life in Sri Aurobindo Ashram, পৃ: 210

তিনি সত্যই বলেছেন। শেষের দিকে মা শিষ্যদের ময়দার খামার ও ছোট শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁর মতে, অর্থকে অতিমানসীয় কাজের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায়। টাকাকে অবজ্ঞা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার প্রতি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া দরকার এবং তাকে শুধু ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত করা দরকার। সম্পদশালী ব্যক্তিকে তিনি পরামর্শ দেন :

> যখন কেউ ধনী হয় এবং খরচের জন্য যথেষ্ট টাকার অধিকারী হয়, সাধারণতঃ তখন তা খরচ করে সুখের জন্য এবং সুখদায়ী জিনিসে সে তখন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, এবং কোনদিন সে টাকা চলে গেলে অসুখী হয় এবং ভীষণ যাতনায় পড়ে যেহেতু অভ্যস্ত জিনিসগুলি তখন সে পায় না। এটাও এক বন্ধন, দুর্বল এক আসক্তি। যে ব্যক্তি নির্মোহ, সে যখন এইসব জিনিসের মধ্যে থাকে তখন ভাল থাকে, যখন থাকে না তখনও ভাল থাকে। সে এই দুইয়েই অনাসক্ত। এটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, যখন থাকে তখন তা ব্যবহার করে, না থাকলেও সে না ব্যবহার করেও ভাল থাকে। এবং সত্তার চেতনার জন্য তার কাছে কোন পার্থক্য থাকে না। এতে তোমরা আশ্চর্য হও, কিন্তু এইরকমই।[1]

শিল্প বাণিজ্যের হোমরা চোমরা ব্যক্তিরাও শ্রীমার সংস্পর্শে এলে সাধারণ বিষয় থেকেই অভিজ্ঞতা পান।

1960-এর কালে শ্রীমাকে সভাপতি করে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি ও ওয়ার্লড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ার্লড ইউনিয়ন মাঝে মাঝে বিশ্বসম্মেলন সংগঠিত করত যেখানে সুশিক্ষিত লোকেরা সমবেত হতেন পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির মূল কেন্দ্র ছিল আশ্রমে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন কেন্দ্র ও গবেষণা-গোষ্ঠীর মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করত। মা সর্বদা পরামর্শ দিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ নিয়ে এই দুটি শাখা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতির প্রয়াস করতেন।

---

1. *Sri Aurobindo and Mother on Money* (1971), পৃ: 17

আশির কোঠায়

1962 শুরু হয় অবসাদের চিহ্ন দিয়ে, এবং 1962-এর তেসরা এপ্রিল মা গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর শরীর ভাল হয়ে ওঠে কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। আশ্রমের প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন বা সাধকদের সাক্ষাৎকার দিতেন কিন্তু আগের সেই মজবুত শরীর আর ফিরে এল না। সেই সময়েই 'সাবিত্রী'র কিছু অংশ নিয়ে Huta-র সাথে ধ্যান করতেন। মা মনের মধ্যে স্থিত বিষয় অঙ্কন করতেন, Huta সেটার সম্পূর্ণ চিত্ররূপ দিতেন।

সাধারণের কাছে মা আবার দর্শন দেন 1963-এর 21 ফেব্রুয়ারী, এবং মানবতার এক সমাহার—সাধকরা, দর্শকরা এবং অন্যান্যরা—করুণা গ্রহণ করেন :

নীরবতার এক মানবীয় রূপ
গ্রহণ করছে নীচের অমৃত তেজঃপুঞ্জ
আকাশ ছিল সমাধিস্থ,
বিশালতার প্রাচুর্য পড়ছিল ঝরে
সেই এক অনুপমের উপস্থিতিতে...[1]

29 মার্চ, 1964 ছিল শ্রীমার সাথে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাতের পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি, এবং এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মা ভরসা দেন যে ঈশ্বরের কৃপা তাঁদের প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছে :

> দু-তিন রাত্রি আগে...শক্তির, সেই সত্য-শক্তির অবরোহণ ঘটেছিল বেশ প্রবলভাবে...[2]

আশ্রমের এবং বাইরের ঘটনায় মা উৎসাহ দেখাতেন। আশ্রম ও শিক্ষা কেন্দ্রে আগন্তুক উৎসুক দর্শকদের অনেকে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে কথাবার্তা বলতেন। জওহরলাল নেহেরুর নিষ্ক্রমণে তিনি ঘোষণা করেন : 'নেহেরু দেহ ত্যাগ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর আত্মা অনন্ত ভারতাত্মা এক হয়ে আছে।' সেণ্টার অফ এডুকেশন বা শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠরত উচ্চশিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তিনি নিউ এজ এসোসিয়েশন

---

1. রমেন, *Sri Aurobindo Circle*, 20 সংখ্যা (1964), পৃ: 96
2. Bulletin, আগস্ট 1964, পৃ: 93

প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ কিশোর গান্ধীর পরিকল্পনামতো এসোসিয়েশন আলোচনা-চক্রের আয়োজন করত, ছাত্ররা আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিত। সুনীল ভট্টাচার্যের রচিত সঙ্গীত সহযোগে মা শ্রীঅরবিন্দের The Hour of God থেকে পাঠ করতেন। মার সুললিত কণ্ঠের স্পষ্টতা ও আবেগ এবং তাঁর বলার ভঙ্গি শ্রোতাদের চেতনার গভীরে নিয়ে যেত। 1963–64 সময়কালে, তিনি সৎপ্রেমকে তাঁর সাথে কথা বলে তা টেপ রেকর্ড করে রাখার অনুমতি দেন। এটা প্রায় দশ বছর ধরে চলে, আধ্যাত্মিক সংলাপের এক অপূর্ব ভাষ্য এর থেকে পাওয়া যায়।

আশ্রমের উপর আক্রমণ

1965-র প্রথমদিকে মা এক শিষ্যকে বলেন, প্রতিকূল শক্তির আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে—এ এক উন্মত্ত ব্যাপার। হিন্দী-বিরোধী বিক্ষোভের অশুভ উন্মত্ততার ছায়া তিনি আগেই দেখতে পেয়েছিলেন, তামিলনাড়ুতে এই বিক্ষোভ হিংসাত্মক আকার নেয়। আন্দোলন পণ্ডিচেরীর ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে, তারাও কিছু বিশৃঙ্খল ব্যক্তির প্ররোচনায় হিংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। 11 ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আসুরিক গুণ্ডার দল উত্তর ভারতের প্রাধান্যের প্রতীক আশ্রম আক্রমণ করে। আশ্রমের Honesty Store, পণ্ডিচেরীতে সদাচার ও সৎনিষ্ঠার আর এক নাম যার, তা লুণ্ঠিত ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আশ্রমের অন্যান্য সম্পত্তি, যেমন চিকিৎসালয়, নার্সিং হোম, ডাকঘর এবং সাধকদের আবাসগুলি আক্রমণ করা হয়। শেষে উচ্ছৃঙ্খল জনতা শ্রীঅরবিন্দের সমাধি অপবিত্র করে, শ্রীঅরবিন্দের ঘরের জানলা ভাঙে এবং মার দোতলার ঘরের জানলা পাথর ছুঁড়ে ভেঙে দেয়।

কিছুদিন অবস্থা খুবই খারাপ মনে হয়। পুলিশ দূরে সরে থাকে, জনসাধারণও নিস্পৃহ ছিল। ঐ সময়ে আশ্রমবাসীরা প্রতি-আক্রমণ করেন বাধ্য হয়ে এবং তরুণ সাধকরা অসম সাহসিকতার পরিচয় রাখেন। মধ্য রাতের পরে পুলিশ আসে এবং পরের দিন সকালে সামরিক বাহিনী আসে। আশ্রমের চারদিকে সশস্ত্র রক্ষী পাহারা দেয় এবং শান্তি স্থাপিত হয়।

ঘটনার মূল্যায়ণ করতে বসে আশ্রমবাসী ও বাইরের মানুষ উভয়েই। তবে মা মনে

করেন, চারটি পরস্পরবিরোধী শক্তিই এর জন্য দায়ী : 'জঙ্গী ক্যাথলিক সম্প্রদায়, যাদের কাছে অ-ক্যাথলিকরা হচ্ছে শয়তানের চর ; অনমনীয় আদর্শের কম্যুনিস্টরা ; ডি. এম. কে. যারা আশ্রমকে উত্তর ভারতের প্রাধান্যের প্রতীক মনে করত ; এবং সর্বোপরি 'জনতার নিম্নাধিকারী কিছু লোক যারা ফরাসী শাসনের নানা সুযোগ পেত এবং কোন রকম পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী।' মা ছেলেমেয়েদের এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে বললেন।

যাকিছু স্বর্গীয় তা শুধু সত্তায়ই নয়, অনুভবেও এইসব ধ্বংসের ঊর্ধ্বে এবং এগুলি তা স্পর্শ করতে পারে না।

সব ক্ষেত্রেই ক্ষতির পরিমাণ থেকেই অপূর্ণতার রূপ ফুটে ওঠে এবং অপরিহার্য প্রগতির পক্ষে এ এক শিক্ষা স্বরূপ।[1]

বহুমুখী কর্মধারা

এই বছরেই মা উচ্চভাবের বীজ বপন করেন, পরে যা অরোভিল রূপে গড়ে ওঠে। তিনি প্রভাতনগরী অরোভিল গড়ে তোলেন, 'কোন জাতিই যে স্থানকে নিজের সম্পত্তি হিসাবে দাবী করতে পারবে না।' Human Cycle-এ রূপায়িত শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন মূর্ত করে তুলতে চাইলেন তিনি :

> মনুষ্যজীবনের মতোই বিরাট এ কাজ, এবং সেজন্য যেসব ব্যক্তি এর দিশারী তাঁরা সব মানুষকে নিয়ে যাবেন তাঁদের এই রাজ্যে। এইসব পথ-প্রদর্শকরা কোন কিছুকেই প্রতিকূল মনে করবেন না, কোন কিছুই তাঁদের সাধ্যের বাইরে মনে করবেন না। কারণ মানবজীবনের সবদিক নিয়ে আধ্যাত্মিকতা—শুধু বুদ্ধিগত দিক নয়, সৌন্দর্যানুভূতি, নৈতিকবোধ, গতিময় জীবনীশক্তি, দৈহিক ; কাজেই এই দিকগুলির যেকোন কাজ বা দায়িত্বে তারা অনীহ বা বিরক্ত হবে না, আত্মার পরিবর্তনে এবং আকারের রূপান্তরে তারা সচেষ্ট হবে... ঈশ্বর সবের মধ্যেই রয়েছেন এটা জেনে তা করতে হবে, তারা অবিচলিত

1. *Bulletin*, এপ্রিল 1965, পৃ: 60

> থাকবে যে সবকিছুকে আত্মার আত্মান্বেষণের মাধ্যম করা যেতে পারে এবং সবকিছুকে আধ্যাত্মিক জীবনরীতির মাধ্যমে রূপান্তরিত করা যায়।[1]

তিনি নিজেই অরোভিল-এর রূপচিত্রণ করলেন, কেন্দ্রে একটি জোড়সহ বৃত্তাকার নক্সা। যথাসময়ে রোজার এ্যাঙ্গার-এর নেতৃত্বে একদল স্থপতি এই নগরের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করলেন। চার অংশে বিভক্ত নগরীর মধ্যে বসবাসস্থল, শিল্পকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল এবং কেন্দ্রস্থলে ছিল মাতৃমন্দির বা সত্যের পবিত্র স্থান। পণ্ডিচেরীর কাছে 15 বর্গমাইল এলাকা জুড়ে নতুন নগরীর পত্তন। প্রকল্পের মুখ্য প্রচারক ছিল নবজাত। UNESCO এতে নৈতিক সমর্থন দেয়।

1965-তে মা সেণ্টার অফ এডুকেশনে 'Free Progress'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। কোন ধরাবাঁধা পাঠ্যসূচী ছিল না, লোকে বহু বিষয়ে সেখানে পড়াশোনা করতে পারত। শিক্ষককে ছাত্রদের শিক্ষায় সামগ্রিক উৎসাহ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হত এবং তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা না দিয়ে আস্তে আস্তে বিজ্ঞানের পথে পরিচালনা করতে হত। এই পদ্ধতিতে ক্লাসের শিক্ষা একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি ; শিক্ষককে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এমনভাবে পড়াতে হত যাতে 'ছাত্রদের পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী সস্নেহ পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জ্ঞানান্বেষণ প্রজ্জ্বলিত থাকে।'

ঐ বছরেই মার আঁকা স্কেচ ও ছবির প্রদর্শনী হয়। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি আঁকা শেখেন এবং আশ্রমের সার্বিক ব্যস্ততার মধ্যেও আঁকার অভ্যাস চালিয়ে যান। তাঁর কাছে ছবি আঁকা, সঙ্গীত, আশ্রমের কাজ, সবকিছুই ছিল যোগ, যা আত্মার মূল থেকে উৎসারিত। 1966-র প্রথম দিকে মার দৃষ্টিতে এক ভাব আসে যাতে মনের মধ্যে বিদ্যাজ্যোতিঃ, মুক্তি ও শক্তির অনুভূতি আসে, ব্যবহারিক জীবনের জান্তব বাস্তবতা ও মূর্ত রূপ যেন কোথায় চলে যায়। শুধু সবকিছুতেই এক হাসি লেগে থাকে! তিনি বলেছেন,

> সবসময়ে হাসা দরকার, সর্বক্ষণ। ঈশ্বর হাসেন এবং তাঁর হাসি এত সুন্দর, এত প্রেমময়। এক অভূতপূর্ব মিষ্টতা নিয়ে এই হাসি তোমায় আলিঙ্গন করে।

যন্ত্রণাবিদ্ধ শীর্ণ দেহ, যা 'অসুস্থতা, যাতনা ও অনিয়মে' পরিপূর্ণ, 'এর সাথে ঐশ্বরীয় সত্তার কোন মিল নেই।' অতিমানসীয় রূপান্তরকে চকিতে সংঘটনশীল কর্ম

---
1. **Centenary Edition, সংখ্যা 15, পৃ: 251**

হিসাবে মনে করা মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। এমনকি মা, যাঁর অলৌকিক মনের অভিজ্ঞতা হয়, তিনিও রাতারাতি দেহ পরিবর্তন করতে পারেন নি :

> একটি দেহে এটা করা সম্ভব হলে সব দেহেই তা করা যায়...অন্যদের থেকে আমি পৃথক কিছু নই। পার্থক্য চেতনায়, এটাই সব...যখন অসুস্থ হই, মন দেহ ছেড়ে গেল, জীবনীশক্তি গেল, দেহ পড়ে রইল—উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই ...দেহেতেই দেহ রইল...জীবনীকোষগুলি চেতনান্তর অবধি জাগ্রত হতে থাকল...প্রেমের বিস্ফোরণের সাথে সাথেই এর শুরু, সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে... তারপর ধীরে ধীরে তা দেহে নামতে লাগল।

তিনিও এই উচ্চ চেতনাবোধ সর্বক্ষণ ধারণ করার মাধ্যম হতে পারেন নি, যদিও অন্যদের চেয়ে তিনি স্বতন্ত্রা ছিলেন, কারণ 'তাঁর দেহে এক রকমের নমনীয় গঠন-যোগ্যতা ছিল...এবং উপস্থিতির সেই ঐশ্বর্য।'

তাঁর বুদ্ধিগত উৎকর্ষ ছিল সর্বদাই তীক্ষ্ণ, সৎপ্রেমের সাথে কথায়ই তা পরিস্ফুট। অসুস্থতা থাক বা না থাক, তিনি আশ্রম ও বাইরের সব ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতেন. যেমন, যখন কিছু আশ্রমবাসী আপাতদৃশ্যভাবে গুজব ও গল্পে মেতে উঠলেন, তখন মা তীব্রভাবে বললেন :

> অন্যে কী করছে না করছে, এ নিয়ে গল্পে মাতা অন্যায়, তা শোনাও খারাপ। তা ঠিক কি না, যাচাই করতে যাওয়াও ঠিক নয়। এই পুরো ব্যাপারটা একজনের সময় নষ্ট করা ও চেতনার অধোগমনের পক্ষে যথেষ্ট। এই বাজে অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করতে না পারলে আশ্রম স্বকীয় আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।[1]

আধ্যাত্মিক চিন্তায় সর্বদা কাজ করে যাওয়া এবং তার দ্বারা মানবতার মঙ্গল-সাধনের মাধ্যমে সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছনোই উদ্দেশ্য, সেজন্যই শ্রীমা তাঁর ছেলেমেয়েদের আহ্বান জানালেন, 'শুধু ঈশ্বরের কাজ করে যাও।' উদ্দেশ্যপূর্ণ ও পবিত্র জীবনযাপন করে কীভাবে সেকাজ করা যায় তা তিনি দেখালেন এবং নব্বইতম জন্মদিবসে এই তাৎপর্যপূর্ণ বাণী দিলেন :

---

1. *Mother India*, ডিসেম্বর 1967, পৃঃ 669–70

কত বছর বাঁচলে, তার বিচারে তুমি বুড়ো হও না। যখন তুমি আর সামনের দিকে এগোতে পার না তখনই বুড়ো হও।...
যখন বুঝবে যে জীবনে যা কাজ করেছ, তা যত কাজ করা বাকী, তারই শুরুমাত্র, ভবিষ্যৎ যখন আকর্ষণীয় সূর্যালোকের মতো অনির্বচনীয় সম্ভাবনায় জ্বলজ্বল করে উঠবে, তখনই তুমি হবে যুবক...যুবা এবং আগামী দিনের অনুভবে ঐশ্বর্যবান।[1]

'অরোভিল'

নব্বুই বছর বয়সেও মা যুবতীর মতো ছিলেন। আকাশবাণীর জন্য এক বেতার-ভাষণ রেকর্ড করেন পরিষ্কার গলায়, সারকথায় ব্যাপক ভাব প্রকাশ করেন :

আমি ভারতে এসেছিলাম শ্রীঅরবিন্দর সাথে দেখা করতে। শ্রীঅরবিন্দের সাথে একসাথে ভারতে থেকে গেলাম।
তাঁর দৈহিক নিষ্ক্রমণের পর তাঁর কাজ সমাধা করার জন্য এখানে থাকলাম। তাঁর কাজ ছিল,
সত্যের সেবা করে ও মানবজাতিকে জ্ঞানদীপ্ত করে তুলে ঐশ্বরীয় ভালবাসার শাসন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা।

এটা এক অদ্ভুত আত্মজীবনীসুলভ ভাষ্য, কোনো কথাই উহ্য থাকেনি এবং এই কথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দশবছর আগে তাঁর জন্মদিনে শিষ্যদের বলেছিলেন, নতুন পৃথিবীর উদ্ভব, অতিমানসীয় ভাবজগতের আবির্ভাবের মতোই জন্মদিন পালন করা উচিত। তবে, মার জীবনী রচনা কে করবেন? তাঁর বাহ্যিক জীবন তো পৃথিবীতে বিকশিত সামগ্রিক সত্যের পরিচয়বাহী নয়।

শ্রীঅরবিন্দের মানবঐক্যের আদর্শ রূপায়ণের জন্য মা 28 ফেব্রুয়ারী 1968-র দুপুরে অরোভিল উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া স্থাপনে মার স্বপ্ন বাস্তব রূপ পায়; বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিশুরা নিজ নিজ দেশের মাটি অরোভিল-এর

1. *Bulletin*, ফেব্রুয়ারী, 1968

কেন্দ্রস্থলের পদ্ম-আকৃতির আধারে রাখেন যাতে সব একাকার হয়ে যায়। আশ্রমের ঘর থেকে মা এই দৃশ্য দেখেন এবং সমবেতদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার গলায় অরোভিল-এর ঘোষণাপত্র পড়েন :

1. অরোভিল বিশেষ কোনো ব্যক্তির নয়।
   সমগ্র মানবতার জন্যই অরোভিল নিবেদিত। তবে অরোভিলে থাকতে হলে ভগবদ্চেতনার সেবক হতে হবে।
2. অরোভিল হবে নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা, ক্রমোন্নয়ন এবং অটুট যৌবনের প্রতীক কেন্দ্র।
3. অরোভিল অতীত ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন রূপে থাকতে চায়। বাইরের ও অন্তরের সব উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে অরোভিল জোরদারভাবে ভবিষ্যৎ সত্তা অনুভব করতে চায়।
4. প্রকৃত মানব-ঐক্যের জীবন্ত প্রতিরূপ গড়ে তোলার ঐহিক ও আত্মিক বিষয়ের গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে অরোভিল কাজ করে যাবে।

অরবিন্দীয় আদর্শের যুক্তিসঙ্গত রূপায়ণে এটাই হওয়া উচিত। এই পরিকল্পনা এবং অরবিন্দীয় বিশ্বদর্শনে এর স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন বাস্তবে রূপদানের দায়িত্ব শ্রীমার ওপর বর্তিয়েছে। নবচেতনার রূপদান ও তার বিকাশে এক নতুন বিশ্বসৃষ্টি, এক নব মানবতা, এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ মা নিয়েছিলেন। বস্তুর প্রকৃতিতে, এটা হচ্ছে এক সমষ্টিগত ভাবনা, সামগ্রিক মানুষের সম্পূর্ণতা সাধনে যার বাস্তব রূপায়ণে সমবেত প্রয়াসের প্রয়োজন রয়েছে।
>
> শ্রীমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত আশ্রমটি এই লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রথম ধাপ। অরোভিল-এর পরিকল্পনা পরবর্তী ধাপ, যা 'আরো বাহ্যরূপ' পেয়েছে—আত্মা ও দেহের সঙ্গতিসাধন, প্রকৃতি ও মনের যোগসূত্র, মানবজাতির মধ্যে সমষ্টিগত জীবনের জন্য পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনই এর উদ্দেশ্য।[1]

এইরকম অতিমানবিক প্রচেষ্টা, মহান শক্তির এই ধরণের প্রেরণাদানকারী বিকাশ —শীর্ণদেহ, কাশি এবং দৃষ্টিহীনতা, ভাষণ ও শ্রুতিতে অক্ষম শ্রীমার পক্ষে অলৌকিক

---

1. All India Magazine, ফেব্রুয়ারী 1974, পৃঃ 23

কাজ নয়! কিন্তু তবু তাঁর আত্মার আভা ছিল উদ্দীপ্ত, এবং সেইসব দিনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসমূহের রেকর্ড-করা বিবৃতি এখনো অদ্ভুত লাগে। ক্রমবর্ধিষ্ণু অন্ধতা ও শ্রুতির হানি সম্বন্ধে মা বলেন :

ঐহিক দৃষ্টিতে আরো বেশি একাগ্রতার দরকার হয়। এই দৃষ্টি স্থিরতা দেয়, বস্তুকে একটা পরম্পরাগত রূপ দেয়। শ্রবণের ক্ষেত্রেও এক কথা। কাজেই যখন এগুলি থাকে না, তখন বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ চেতনা আসে, সেটাই প্রকৃত জ্ঞানদান করে। অতিমানসীয় ভাব এইভাবেই কাজ করবে নিশ্চয়...

বস্তুকে সম্পর্কিত করা বা জানা হচ্ছে বস্তু বা ব্যক্তির সাথে চেতনাকে এক করা। স্বাভাবিক বোধে পৃথক করার পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন একীকরণের বোধ থাকে। আরো বহু উৎসাহজনক অভিজ্ঞতা আছে। বহুলোক আছেন যাঁরা আমায় ডাকেন এবং আমার সম্বন্ধে চিন্তা করেন। এবং তা আমার চেতনার পরিধিতে আসেও। কিছু সময় পর আমি বুঝি : 'এই লোক এসেছে' অথবা 'এই লোকের কিছু হয়েছে' এবং আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি জানি।' যে সময়ে ঘটনা হয়, আমায় তখন বলা হয় না। কিন্তু আমি সচেতন থাকি, যেন আমার সত্তায় কিছু হচ্ছে এইরকম ভাব।[1]

তারপর অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মতো অনুরূপ অভিজ্ঞতার উদয় হয় :

তিনিই সবকিছু, তিনি, তিনি ছাড়া কিছু নেই। কেউ নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে না, নিজের মধ্যে তাঁর নিশ্বাস গ্রহণ ছাড়া ;

তোমার চলার মধ্যেও তিনি বিরাজ করেছেন ; তুমি আছ, সব, সবকিছু, সমগ্র বিশ্ব তাঁর মধ্যে বিরাজ করছে—বস্তুগতভাবে, দৈহিক ভাবে।

1969-এর একেবারে প্রথমদিকে, এক নতুন শক্তি অবরোহণের অভিজ্ঞতা হয় তাঁর :

রাত্রে আস্তে আস্তে এটা আসে, এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় মনে হয় যেন এক স্বর্ণকরোজ্জ্বল প্রভাতের উদয় হয়েছে, পরিবেশটা এত সুন্দর ছিল। দেহে অনুভব করলাম...এক উজ্জ্বল আলো, স্বচ্ছ এবং সদয়... এ এক নতুন অবস্থা।

---

1. Sri Aurobindo Circle, ত্রিশতম সংখ্যা, পৃঃ 24

সময়ে সময়ে হিংসা ও দুঃখে ভারাক্রান্ত বিশ্বের কথা তাঁকে ব্যথিত করত, কারণ বিশ্বের সব ঘটনাবলী সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠেন : 'ওঃ! এই বিশ্ব আছে কেন?' তাঁর মনোজগতের গহন থেকেই উত্তর আসে যে 'আলোর দিকে এক বিশাল প্রবেশদ্বার' রয়েছে এবং অন্ধকার হতে আলোয় উত্তরণের জন্য তাঁকে লড়াই করতে হবে। রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর, 1969 এ যখন মাকে দেখতে আসেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণীতেই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে মানবতার জন্য মার ঐকান্তিকতা সুপরিস্ফুট ; এতে শ্রীমা বলেছিলেন :

> ভারত ভবিষ্যৎ রচনায় কাজ করুক ও নেতৃত্ব দিক। এইভাবেই সে পৃথিবীতে তার স্থান পুনরুদ্ধার করবে।
>
> বহু যুগ থেকেই বিভেদ ও বিরোধের মাধ্যমে শাসনের রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। ঐক্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে শাসন করার দিন এসেছে।
>
> সহযোগী পেতে হলে দলগত পরিচয়ের চেয়ে মানুষের মূল্যবোধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
>
> দেশের মহত্ত্ব কোনো বিশেষ দলের হয়ে নয়, সব দলের সমবেত ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল।

1970-এ মার নববর্ষ বাণী—'এক বিরাট পরিবর্তনের জন্য বিশ্ব প্রস্তুত। আপনি কী সাহায্য করবেন?'—বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সমগ্র মানবজাতির কাছে এটা এক আবেদন। 'শিল্পবাণিজ্যসহ জীবনের সবক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারার বাস্তব প্রয়োগের জন্য' শ্রীমা 'শ্রীঅরবিন্দ কর্মধারা' আন্দোলন সংগঠিত করেন। উদার পিন্টো-র পরিচালনায় এই আন্দোলন মার নিম্নলিখিত বাণী নিয়ে তীব্রগতি সঞ্চার করে :

সুকথা বলা ভাল,
সুকাজ করা আরো ভাল।
তোমার ক্রিয়াকলাপ কখনোই যেন
তোমার কথার চেয়ে ভিন্ন না হয়।

অরোভিল-এ মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় 21 ফেব্রুয়ারী, 1971, মার জন্মদিবসে।

জীবন্ত শিখা

1972 সালটি ছিল শ্রীঅরবিন্দের শতবার্ষিকী, এবং ঐ বছর 15 আগস্ট সারা ভারত ও বিশ্বের নানা স্থানে তাঁর জন্মদিবস উদযাপিত হয়। বেতারে প্রদত্ত মার বাণীতে বলা হয় :

> শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যতের মানুষ ; ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রবক্তা তিনি। ঐশ্বরীয় ইচ্ছায় যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি, তার ত্বরিৎ রূপায়ণে তিনি আমাদের পথ দেখাবেন।

এই বছরেই মা পরবর্তী বছরে তাঁর সম্ভাব্য অবসর গ্রহণের কথা বলেন। এক মহান গৌরবের সম্ভাবনা ছিল এবং অন্যদিকে এই বোধ ছিল যে 'যে কোনো মুহূর্তে হয়ত কেউ মারা যেতে পারেন—মরা নয়, শুধু দেহ হয়ত ক্ষয় পেতে পারে।' ঐ বছরে তাঁর দেহ নিদারুণ ভেঙ্গে পড়ে। আশ্রমে দর্শনার্থী আসে বহু এবং 15 আগস্ট ও 24 নভেম্বর, 1972-এ তাঁর 'দর্শন'-এ ছেলেমেয়েরা দারুণ উৎসাহ পায়। অনিবার্যভাবেই কাজের চাপে তাঁর দেহ ভেঙ্গে পড়ে, আগেই অসুখ-বিসুখে শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল। এমনকি 1973-এর 21 ফেব্রুয়ারীতে 95 বছর বয়সেও তিনি দর্শন দেন ; এবং 24 এপ্রিলেও দর্শন দেন। 20 মে তিনি একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়েন ; আশ্রমের ডাক্তার সান্যাল এবং JIPMER-এর ডাঃ বিস্ট সবসময়ে তত্ত্বাবধান করছিলেন। মা দু'একটি কথা বলতেন এবং অনেক সাধ্যসাধির পর দৈনিক কুড়ি আউন্স খাদ্য গ্রহণ করতেন। পরের কয়মাস একই অবস্থা থাকে। একটু আধটু হাঁটাচলা করতে পারতেন, তবে বহু কষ্টে। 15 আগস্ট অবশ্য তিনি আবিষ্ট ভাব কাটিয়ে ওঠেন এবং দর্শন দেন, তাঁকে দেখার জন্য কয়েক হাজার লোক পণ্ডিচেরীতে এসেছিলেন। সন্ধ্যা ছয়টায় অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু তবু শিশু বৃদ্ধ যুবা সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল করুণাময়ী মা-কে দর্শনের জন্য। বৃষ্টি থামল। মাকে বারান্দায় আনা হোল, গরাদ ধরে তিনি আস্তে আস্তে এগোলেন এবং সম্মুখে অপেক্ষমান জনসমুদ্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। আট হাজারেরও বেশি মানুষ নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর করুণাবাণী শুনলেন :

আমরা যেন মৃত তন্ত্রী, আপনার করুণায়ই
এই তন্ত্রী জীবন পেয়েছে।

আমরা দগ্ধ বস্তুর মতো, কখনো কি
আমরা আপনার প্রকৃত সেবক হতে পারব !
হে প্রভু, অহংবোধ, মিথ্যাচার ও আসক্তির
আগাছা নির্মূল করুন।
আপনার প্রেমের দহনে
সব সোমরাজময় লালসা নিবৃত্ত হোক।
কল্পনার এই আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তে,
শেষ যেন এক অশেষ ধারার শুরু।[1]

কিছুদিন পরই মা আবার বেহুঁশের মতো অবস্থায় পড়লেন। নভেম্বরের প্রথম ক'দিন দুবার হিক্কা, প্রচণ্ড কাশিতে আক্রান্ত হন। তাঁর হৃদযন্ত্র ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে, রক্তচাপ নেমে যায়। তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন, ব্যক্তিগত নিবেদনে মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে তাঁর। 17 নভেম্বর সন্ধ্যা 7-25 মিঃ-এ মা তাঁর দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হন।

মার দেহ অডিকোলন দিয়ে পরিষ্কার করা হল, নতুন কাপড় পরিয়ে, সোনার জরি দেওয়া শাল জড়িয়ে, তাঁর দেহ Meditation Hall-এ রাখা হল। 18 তারিখ সকালে, প্রথমে আশ্রমবাসীরা এলেন শেষ দর্শন-এর জন্য। তারপর জনসাধারণের জন্য মূল প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হল। যে মহিলা তাঁর সবকিছু ভারতের জন্য উৎসর্গ করেছেন তাঁকে শেষবার দেখার জন্য মানুষকে আসতে দেওয়া হল। আশ্রম থেকে সারা বিশ্বে জানিয়ে দেওয়া হল, হৃদযন্ত্র বিকলের জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং বিশ্ববাসীকে তাঁর বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল : 'এক নব মানবতার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।'

মার নিষ্ক্রমণে ভারতে শোকের ছায়া নেমে এল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কথায় সারা জাতির দুঃখ প্রতিভাত হল, এবং জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে তিনি বললেন :

> মা ছিলেন অসীম চরিত্রবল ও অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না এক গতিশীল, উদ্দীপ্তপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তবু আশ্রম চালাবার ব্যাপারে, সমাজসেবার

---

1. কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, *Tryst With the Divine* (1974), পৃ: 24

ক্ষেত্রে, অরোভিল-এর প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে, এবং শ্রীঅরবিন্দ ভাবধারা রূপায়নে যেকোনো প্রকল্পের কাজে তাঁর দৃঢ় বাস্তব দৃষ্টি অক্ষুন্ন ছিল।
মানসিকভাবে তিনি ছিলেন তরুণ, দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক, কিন্তু ভারতের মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং মানবজাতির কাছে নতুন দিক তুলে ধরতে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সোচ্চার ছিলেন।

আশ্রমের সম্পাদক নলিনীকান্ত গুপ্ত, যিনি এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী ছিলেন, আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দেবার জন্য এই বাণী প্রকাশ করলেন :

মধুর মা আমার,
তোমার দেহ আগের সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে, কেননা তুমি সবসময়েই তোমার শিশুদের একাত্ম হতে চেয়েছিলে। এই দেহ তুমি ধারণ করেছিলে নতুন দেহ সৃষ্টির জন্য এবং তুমি যা চেয়েছ এর থেকে তা পেয়েছ।
তোমার ছেলেমেয়েদের, বিশ্বের আহ্বান ও আকুতি, ভালোবাসা এবং সেবা সকৃতজ্ঞ হয়ে তোমার পদতলে উৎসর্গীকৃত।

20 তারিখে সকাল 8-20 মিঃ-এ মার পূর্ব-ইচ্ছানুযায়ী Service Tree-র নীচে জোড়া প্রকোষ্ঠে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়। নীচের প্রকোষ্ঠে তেইশ বছর আগে শ্রীঅরবিন্দের দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের সমাধির চারপাশে সমবেত কয়েক সহস্র ব্যক্তির উপস্থিতিতে মার সমাধির কাজ অনুষ্ঠিত হয়। নীরব-প্রার্থনা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁরা স্বকীয় দুঃখ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন :

তবু অলৌকিক ঘটনা কি হয়ে যেতে পারে শেষ ?
সেই প্রভাচ্ছটা হয়ে যাবে অন্তর্হিত ?
আলোক সূত্রের অভিভূতি এই
এর ব্যাপ্তিও বটে।
একাগ্র সাধনার কেন্দ্র এই
পরিব্যপ্ত বিশ্বময়।
অলৌকিক আলোক প্রভার অবরোহণ
স্বর্গীয় কৌশলের বার্তাবাহী।

অ-চেতন আর অজ্ঞানতার জোট
এখানেই পরাভূত।
কুজ্ঝটিকা ও তমসা মুক্ত হয় আলোকস্পর্শে
আত্মার রক্তিমাভা পায় বস্তু আর।
জীবনের প্রতিশ্রুত রূপবদল
শুরু হয় অনুভবের পর্বে।
লক্ষকোটির ক্ষমতা তাঁর প্রতি হয় উন্মুখ
পূর্ণ হয়, একাত্মবোধে পূর্ণ হয়,
সবার মাঝে বিকশিত হয় এক আলো
আর তাতেই প্রজ্জ্বলিত হয় সবকিছু।[1]

---

1. কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, *Tryst with the Divine* (1974), পৃ: 42